রাজার মতন রাজা

শহীদ আখন্দ

facebook/@maktabatuttalamij

রাজার মতন রাজা
শহীদ আখন্দ
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪০
ইফা প্রকাশনা : ৩৭২/১
ইফা গ্রন্থাগার : ৮০৮.০৬৮
ISBN : 978-984-06-1547-5
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮০
দ্বিতীয় মুদ্রণ (রাজস্ব)
নভেম্বর ২০১৭
কার্তিক ১৪২৩
সফর ১৪৩৯

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বোরহান উদ্দিন মুহাম্মদ আবু আহসান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলাইমক ফাউন্ডেশন প্রেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৫৩৭
মূল্য ৬৪.০০ টাকা

RAJAR MOTON RAJA (Story of Sulaiman the Magnificent for children) Written by Shahid Akhand, in Bangla, and published by Dr. Mohammad Abdus Salam, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538

E-mail : publicationifa@gmail.com
Website: www. islamicfoundaton.gov.bd

Price : Tk. 64.00; U.S.S 3.00

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমাদের দেশের শিশু-কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থ সব সময়ই প্রকাশ করে আসছে। এর মূল লক্ষ্য আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের শিশু-কিশোরদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ইসলামের ইতিহাস থেকে এরকমই একটি কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে এ বই-এ।

অনেকদিন আগের কথা। তুরস্কের সুলতান তখন ছিলেন সুলায়মান। সব দিক দিয়ে ভালো ছিলেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিলো মহানুভব সুলায়মান—সুলায়মান দি ম্যাগনিফিসেন্ট। সুলতান সুলায়মান বিশ্ব জয়ে বেরিয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিলো, ইসলাম ধর্মের মহান ও উদার পতাকার নিচে সবাই এসে জমায়েত হবে। এ বইয়ে কথাশিল্পী শহীদ আখন্দ উপন্যাসের মতো মনোরম আর হৃদয়গ্রাহী করে সুলতান সুলায়মানের কাহিনী লিখেছেন।

বইটি ইতিপূর্বে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি বইটি এবারও পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

facebook/@maktabatuttalamij

লেখকের কথা

অনেকদিন আগের কথা। তুরস্কের সুলতান তখন ছিলেন সুলায়মান। সুলতান সুলায়মান সবদিক দিয়ে ভালো ছিলেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল মহানুভব সুলায়মান। 'সুলায়মান দি ম্যাগনিফিসেন্ট' নামে এখনো পৃথিবীর সব লোক তাঁকে এক ডাকে চেনে। সুলতান সুলায়মান বিশ্ব জয়ে বেরিয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিলো, ইসলাম ধর্মের মহান উদার পতাকার নিচে সবাই এসে জমায়েত হবে। এ বইয়ে কথাশিল্পী শহীদ আখন্দ উপন্যাসের মতো মনোরম আর হৃদয়গ্রাহী করে সুলতান সুলায়মানের কাহিনী লিখেছেন।

—লেখক

facebook/@maktabatuttalamij

রাজার মতন রাজা

ছোট হোক বড় হোক, তুমি যদি কোন কাজ করতে চাও, তাহলে সবার আগে কি ঠিক করতে হবে বলো তো ?

সবার আগে কি ঠিক করতে হবে এটা তো সবাই জানে। তুমিও জানো। সবার আগে ঠিক করতে হবে, তুমি কি করতে চাও! অর্থাৎ কাজটা কি ?

তারপর ঠিক করতে হবে, তুমি কেমন করে কাজটা করবে। কি কি জিনিস লাগবে কাজটা করতে তার একটা লিস্ট বানাতে হবে। জানতে হবে সেসব জিনিসপত্র কোথায় পাওয়া যায়। এই রকম কাজ আগে যারা করেছে তাদের কাছে যেতে হবে, খবর নিতে হবে কেমন করে তারা করেছিল সে কাজ। তারপর সব যোগাড়যন্ত্র হয়ে গেলে, সব খবরাখবর নেওয়া হয়ে গেলে তুমি হিসাব করবে কোন্‌টা আগে করবে, কোনটা পরে করবে। তারপর ভালো করে মনোযোগের সঙ্গে শুরু করবে কাজটি একদিন শুভক্ষণে। এই তো ?

সুতরাং প্রথমে দরকার লক্ষ্য। কি তুমি চাও, কি তুমি করতে চাও। তারপর দরকার কেমন করে তুমি তা পারবে, বা করবে তা ঠিক করা।

একটা উদাহরণ দিই।

ধরো, ডিসেম্বর মাস এলেই তোমার মন খারাপ হয়। কেন ? না, তুমি ভেবেছিলে এবার নির্ঘাত পরীক্ষায় তুমি ফার্স্ট হবে। অনেক পরিশ্রম করেছো, পড়াশুনা করেছো দিনরাত। গত বছরের চেয়ে একটু বেশিই করেছো। কাজেই ফার্স্ট না হওয়ার কোন কারণ নেই। একেবারে ধরেই নিয়েছিলে, তুমি ফার্স্ট হবেই। এবং ফার্স্ট হলে পরে কি রকম একটা লম্ফ তুমি মারবে সেটাও ঠিক করে রেখেছিলে। কিন্তু ফল বেরোলে দেখা গেল কোথায় ফার্স্ট! সেকেন্ড-থার্ডেও নাম নেই। তোমার মন খারাপ হলো। গত বছরও এমন হয়েছিল। আশা করেছিলে, আশা পূরণ হয়নি। একটা কাজ করতে চেয়েছিলে, কাজটা করতে পারোনি। একটা কাজ তুমি করতে চাচ্ছো, করতে পারছো না, ব্যাপারটা কি ? এতো পরিশ্রম বৃথা যাচ্ছে কেন ?

facebook/@maktabatuttalamij

তুমি ঘুম থেকে উঠে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসো রোজ। ব্যাপারটা কি ? তুমি ফার্স্ট হতে চাও, কোন সন্দেহ নেই। পড়ছো, খাটছো, তবু হচ্ছে না কেন ?

তারপর অনেক চিন্তা ভাবনা করে তুমি একদিন ঠিক বের করে ফেললে কারণটা কি। কারণটা আর কিছু নয়। তুমি ফার্স্ট হতে চাও তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গোল বেঁধেছে ফার্স্ট হওয়ার কায়দাটা নিয়ে। কেমন করে ফার্স্ট হতে হয় সে বিষয়ে তুমি কোন খবর নাওনি। খবর নিলে তুমি হয়তো দেখতে পেতে, আগে যারা ফার্স্ট হয়েছে তারা দিনে কয় ঘণ্টা পড়াশুনা করেছে। সকালে কয় ঘণ্টা, রাত্রে কয় ঘণ্টা। কিভাবে সব বই ঘেঁটে ঘেঁটে নিজে নিজে ওরা নোট তৈরি করে, প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে। এক একটা বিষয়ের জন্য এক একটা খাতা তৈরি করে নেয়। তারপর পরীক্ষার আগে তারা রিহার্সেল দেয় ঃ মনে করি এটা ইংরেজির প্রশ্ন। এই হলো দশটা প্রশ্ন। সময় তিন ঘণ্টা। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য কতো মিনিট সময় পাওয়া যাবে? প্রথমে প্রশ্ন পড়ার জন্য পাঁচ মিনিট। তারপর সবার শেষে রিভিশন দেওয়ার জন্য পনেরো মিনিট। মোট তিন ঘণ্টা থেকে এই বিশ মিনিট চলে গেলে থাকে ১৬০ মিনিট (৩ ঘণ্টা x ৬০=১৮০ মিনিট। ১৮০-২০=১৬০)। তাহলে দশটা প্রশ্নের জন্য ১৬০ মিনিট থাকলে একটা প্রশ্নের জন্য থাকবে ১৬ মিনিট।....এমনি করে ওরা সবকিছু হিসাব করে নিয়েছে একদম নির্ভুল। একেবারে নির্ঘাৎ তারা প্রথম হয়েছে, কোন সন্দেহের কোন অবকাশ রাখেনি কোথাও। অর্থাৎ, তারা কি চায়, কেন চায় এবং কেমন করে তা পাবে—সবখানে দুয়ে দুয়ে চারের হিসাব। দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে চার হবেই, তাতে কোন ভুল নেই। কোন ফাঁক নেই, কোন সন্দেহ নেই। অতএব যা তারা চায় তাই তারা পায়।

অথবা ধরো, তুমি একটা পুতুল বানাতে চাও।

প্রথমে তোমার ঠিক করতে হবে কি পুতুল তুমি বানাবে। ছেলে পুতুল না মেয়ে পুতুল ? ছোট না বড় ? কাঠের না কাপড়ের ? সেদিন তোমার বড় খালার বাসায় গিয়ে খুব সুন্দর একটা কাপড়ের পুতুল দেখে এসেছো। তখন থেকেই তুমি মনে মনে ভেবে রেখেছো, ও রকম একটা পুতুল কি ইচ্ছে করলেই তুমি বানাতে পারো না ? ধরো, তুমি ওই রকম একটা পুতুল বানাবে। তাহলে তুমি ঠিক করে নাও কি কি করতে হবে। প্রথমে কাপড় লাগবে। কাপড় ? সে তো আছেই হরেক রকমের তোমার কাছে অজস্র। তুলো লাগবে। তুলো আছে আম্মা মনির কাছে। রং লাগবে, রংও আছে। চুল ? কিনতে হবে। চোখ ? দুটো মার্বেল কিনতে হবে। পায়ের স্যান্ডেল ? একটু যদি পাটের দড়ি আর হার্ডবোর্ড হয় তাহলেই হয়ে যায়। আর কি লাগবে ? একটু মোটা তার লাগবে ফ্রেমের জন্য। আর ? আর কিছু না ? তাহলে তোমার কাছে কি কি আছে আর কি

facebook/@maktabatuttalamij

কি নেই হিসাব করে নাও। তোমার কিনতে হবে চুল, চোখ, স্যান্ডেল আর ফ্রেমের তার। ব্যস। কিন্তু কি করে আদায় করবে ? কোন চিন্তা নেই। ভালো করে দুদিন পড়াশুনা করলে আব্বু-আম্মুর কাছে যা-ই চাওয়া যায় তা-ই পাওয়া যায়। তারপর সব জিনিসপত্র হাতের কাছে নিয়ে, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বসে বসে কেবল একটার পর একটা জোড়া দিলেই হলো।

অথবা ধরো তুমি একটা রেডিও বানাবে। মোটেই শক্ত নয়, খুব সোজা। প্রথমে তুমি জেনে নাও রেডিও বানাতে কি কি লাগে। তারপর জেনে নাও, কেমন করে সেগুলো জোড়া দিতে হয়। জিনিস সংগ্রহ করে বসে গেলেই হলো। যারা জানে তাদের কাছে গেলেই হলো। কোন কোন বইয়ে আবার লেখা থাকে, বইগুলো ভালো করে পড়লেই হলো। অর্থাৎ তুমি যদি সত্যি সত্যি চাও, রেডিও একটা তুমি বানাবেই, তাহলেই হলো। বাকিটা কেবল যোগাড়-যন্ত্র আর হিসাব-টিসাবের ব্যাপার।

এইসব ছোট খাট কাজে লক্ষ্য স্থির করে এগোলে যা করতে চাও, তাই করতে পারবে। আবার তোমার উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে বড় বড় কাজও করতে পারবে। ছোট কাজের ছোট প্রস্তুতি। বড় কাজের বড় প্রস্তুতি।

অনেকদিন আগে। এখন যেটা তুরস্ক, যার উত্তরে কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর সেখানে এক সুলতান ছিলেন। রাজাকে কোথাও সুলতান বলা হয়। সেখানে এক সুলতান ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সুলায়মান। সুলতান সুলায়মান। খুব ভালো ছিলেন এই সুলতানটি সব দিক দিয়ে। এতো ভালো যে সবাই তাঁর নাম দিয়েছিল মহানুভব সুলায়মান। মহানুভব মানে মহান হৃদয়। সুলায়মান দি ম্যাগনিফিসেন্ট নামে এখনো পৃথিবীর সব লোক তাঁকে এক ডাকে চেনে।

সেই সুলতান সুলায়মান বিশ্ব জয়ে বেরিয়েছিলেন। পৃথিবী জয় করতে চেয়েছিলেন আর কি।

কেন, কেন ? হঠাৎ তিনি পৃথিবী জয় করতে বেরোলেন কেন ?

না, ঠিক হঠাৎ নয়। আগে থেকে হিসাব করেই তিনি একাজে নেমেছিলেন। কারণটি হলো, তিনি দেখে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যার হাতে শক্তি থাকে, তাকেই লোকে মান্য করে ভয় পায়, কথা শোনে। ইউরোপের সব রাজরাজারই কথায় কথায় তাঁকে হেনস্তা করে, তাঁর নাম শুনলে নাক সিঁটকায়, সব সময় খিটিমিটি লেগেই আছে তাদের সঙ্গে। এর একটা সুরাহ দরকার।

তিনি বুঝলেন, তিনি যদি শক্তিমান হন, যদি রাজ্য জয় করতে পারেন, তাহলে তাঁর দিকে মানুষ ঝুঁকবে। তাঁর যে ধর্ম তার দিকেও মানুষ আকৃষ্ট হবে। এতে করে ইসলাম ধর্মের মহি সবাই বুঝবে। ইসলাম ধর্মের মহান উদার পতাকার নিচে সবাই এসে জমায়েত হবে। এবং ত

facebook/@maktabatuttalamij

ফলে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি, কামড়াকামড়ি দূর হয়ে যাবে। কারণ ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। তিনি যদি রাজ্য জয় করে নিজের ধর্মের আদর্শের দিকে সবাইকে আকৃষ্ট করতে পারেন, তাহলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সব মানুষের মঙ্গল হবে।

কাজেই তিনি লক্ষ্য স্থির করে ফেললেন। তিনি রাজ্য জয় করবেন, শক্তি অর্জন করবেন। তিনি প্রমাণ করবেন জ্ঞানে গুণে, শক্তিতে সাহসে, শৌর্যে বীর্যে, আচার আচরণে তিনি সবার চেয়ে বড়। তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ তার ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবে। কিন্তু সেটা কি করে করবেন ? তিনি বসে গেলেন হিসাব করতে। কি কি তার আছে। কি কি তার চাই। কোথায় কোন দেশের অবস্থান, কোথায় কোন দিক দিয়ে যেতে হবে, ইত্যাদি সব খবর। এই সব খবর জোগাড় করে রীতিমতো সব হিসাব করে তিনি নেমেছিলেন বলেই তিনি যা চেয়েছিলেন তা-ই পেয়েছিলেন। কোথাও হারেননি।

এখানে কিন্তু একটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

এই যে হিসাব করে কাজ করার গুণ এটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষের কাছ থেকে। পূর্বপুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি উজ্জ্বল ছিলেন তার নাম ছিল সুলতান মুহম্মদ, দ্বিতীয় মুহম্মদ। সুলতান সুলায়মানের পিতা সুলতান সেলিম (খুব ভাল)। সেলিমের পিতা সুলতান বায়েজিদ (বেশি ভাল না)। তার পিতা সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ (দারুন)।

সেই দ্বিতীয় মুহম্মদই ছিলেন সুলতান সুলায়মানের আদর্শ পুরুষ। কেন ? বলছি।

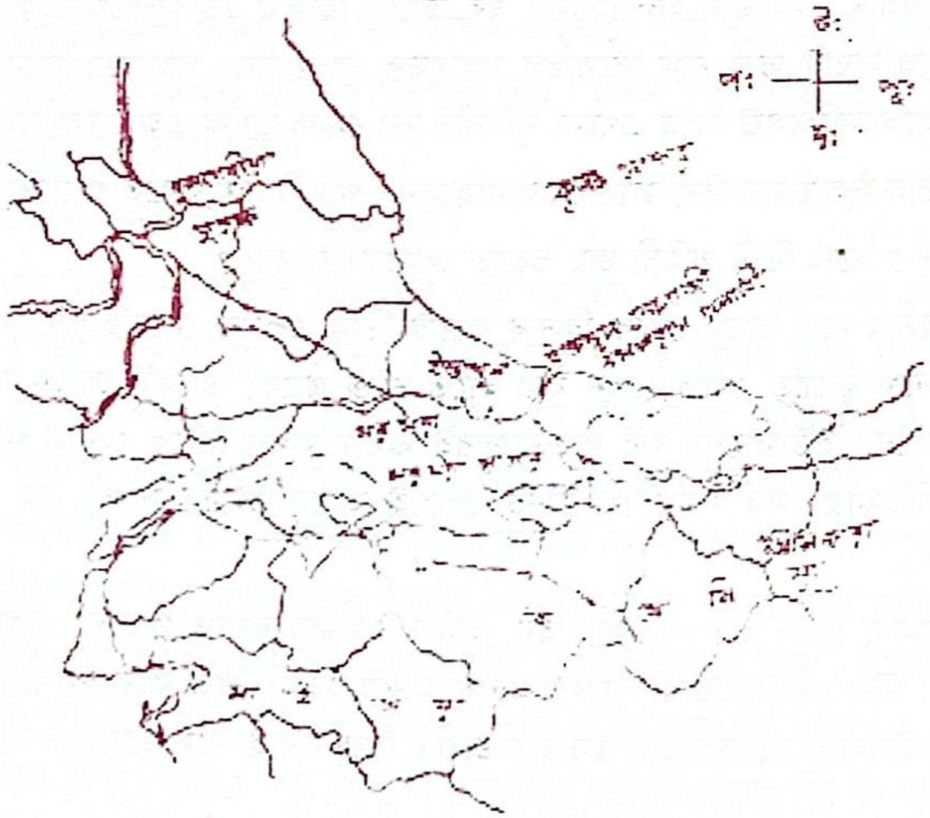

facebook/@maktabatuttalamij

দ্বিতীয় মুহম্মদ সুলতান হওয়ার পরই স্থির করলেন কনষ্টান্টিনোপল নগর দখল করবেন। কারণ, বাইজেন্টিয়াম সাম্রাজ্য ছিল খ্রিস্টানদের সাম্রাজ্য। ইউরোপ তাদের প্রভাব বিস্তার করতে গেলে কনষ্টান্টিনোপল দখল করা ছাড়া তো গতি নেই। জাতি হিসাবে ওঁরা বড় একথা প্রমাণ করার জন্য শক্তি হিসাবেও তারা বড়, একথাও প্রমাণ করতে হবে। এতো হলো এক নম্বর কারণ। দুই নম্বর কারণ হলো, কনষ্টান্টিনোপল এশিয়া ও ইউরোপ এই দুই মহাদেশের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। তুমি ম্যাপ খুলে দেখো, ভূমধ্যসাগর থেকে কৃষ্ণসাগরে যেতে গেলে বসফরাস প্রণালী দিয়ে যেতে হবে। এর ঠিক উপরে, অর্থাৎ উত্তরদিকে এই নগরী।

এই কনষ্টান্টিনোপল যার হাতে থাকবে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যও তার হাতে। কারণ, এই নগরীর ভিতর দিয়ে ছাড়া ইউরোপে প্রবেশের আর কোন সহজ উপায় নেই।

দু'টো কারণ বললাম তো। আর একটা কারণ ছিল, সেটা কোন ঐতিহাসিক কিন্তু জানে না। জানলেও কি জানি যেন কেউ বলে যায়নি ইতিহাস বইয়ে। দারুণ সুন্দর একটা কারণ বলছি।

ইসলাম ধর্মের জন্মের পর থেকে এই নগরী দখল করার চেষ্টা করেছে মুসলমানরা। কিছুতেই পারছিল না। বারবার তারা চেষ্টা করছিল, বারবার সে চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল। কতো খলীফা সুলতান জিদ ধরল, বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কনষ্টান্টিনোপল রইল কনষ্টান্টিনোপলের জায়গাতেই।

খলীফাদের পর এলেন তুর্কী সুলতানরা। অর্থাৎ এই মুহম্মদের বাপ-দাদা সুলতানেরা। তাঁদের মনে স্বপ্ন ছিল তারা বিশ্ব জয় করবেন। ইউরোপের তাঁরাই হবেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অতএব আমাদের কনষ্টান্টিনোপল চাই।

কিন্তু চাইলেই তো হবে না। ভীষণ শক্ত নগরী। চারদিকে দেয়াল। আর অনেক লোকজন তার। ওর গায়ে হাত দিতে গেলেই ইউরোপের সমস্ত খ্রিস্টান একত্র হয়ে যায়। এমনিতে কিন্তু ইউরোপের খ্রিষ্টান রাজারা একে অপরের চক্ষুশূল, মুখ পর্যন্ত দেখাদেখি নেই। সব সময় কে কাকে হেনস্ত করতে পারবে, সেই ফিকির। যুদ্ধ হয় তাদের মধ্যে, রক্তারক্তি। গুপ্তহত্যা তো লেগেই আছে। কিন্তু যেই কোন বাইরের শক্তি কনষ্টান্টিনোপলের গায়ে হাত দিতে যায়, অমনি সব শেয়ালের এক রা। কি যেন যাদুবলে ইউরোপের সব খ্রিষ্টান এক হয়ে যায়। কেউ এর কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না।

facebook/@maktabatuttalamij

খুব খারাপ লাগল সুলতান মুহম্মদের। শত শত বছর ধরে চেষ্টা করেছে একটা কাজ করতে তার পূর্বপুরুষেরা। করতে পারেনি। ছি! ছি! এটা লজ্জা, এই লজ্জার তুলনা নেই। সবাই চেয়েছে কনষ্টান্টিনোপল, কেউ নিতে পারেনি। খুবই খারাপ কথা।

এই যে সবাই চেষ্টা করে হেরে গেছে, কেউ পারেনি-এটাই হলো সেই অলিখিত কারণ কনষ্টান্টিনোপল দখল করার, যা কোন ঐতিহাসিক লিখে যাননি।

মুহম্মদ যখন তুর্কী সিংহাসনে বসেন সুলতান হয়ে, তখন তার বয়স মাত্র একুশ বছর। বয়স কম হলে কি হবে, ভীষণ জেদী। অত্যন্ত গম্ভীর। খালি কি যেন চিন্তা করেন। কথা বলেন কম। যা চান তাই করেন।

facebook/@maktabatuttalamij

একদিন খুব ভোরে (খুব ভোরে উঠতেন তিনি, জগতের সব মহাপুরুষেরা খুব ভোরে উঠতেন, সে তো তোমরা জানোই !) প্রাসাদের ভিতরে নিজস্ব বাগানে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সুলতান। অনুচ্চস্বরে বললেন, এটা হয় না। কেউ পারেনি বলেই আমাকে পারতে হবে। আমি কনস্টান্টিনোপল জয় করবই।

বলেই তিনি চমকে উঠলেন। কেউ শুনে ফেলেনি তো ? অদ্ভুত সুলতান। কোন কাজ করতে চাইলে তিনি কাজটি না হওয়া পর্যন্ত বলেন না কাউকে, কি তিনি চান। সেই গোপনীয়তায় তিনি শক্তি খুঁজে পান। কারণ তিনি জানেন, যারা বেশি বকবক করে, তাদের বকবকানিই সার, তারা কোন কাজের হয় না। তাদের বাক্যবাগীশ বলা হয়, কর্মবীর বলা হয় না।

তিনি কি চান স্থির করে ফেললেন।

সুলতান স্থির করে ফেললেন, তিনি যুদ্ধ করবেন, কনস্টান্টিনোপল জয় করবেন, ইউরোপ জয় করবেন, সবাই তাঁকে মানবে, সবাই তাঁর ধর্মকে তাঁর চরিত্রকে শ্রদ্ধা করবে। কেউ তাঁকে হেনস্তা করবে না। অতএব তিনি প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। প্রস্তুতি তো, কিছুতেই চাপা থাকে না। অনেক রকম ব্যাপার-স্যাপার আছে। কাজেই জিনিসটা কি, কেউ জানল না। জানল, কি যেন একটা কিছু হচ্ছে। কিছু একটা তিনি করতে যাচ্ছেন।

একদিন একজন সভাসদ তাঁকে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, 'হুজুর, ব্যাপারটা আমি তো বুঝতে পারছি না। কি যেন একটা করবেন মনে হচ্ছে। —বড় সড় ?

সুলতান জবাব দিলেন, 'করব তা সত্যি। কিন্তু কি করব সেটা আমি কাউকে বলব না। আমি কি করব, তার আভাস যদি আমার কোন চুল পর্যন্ত জেনে ফেলে, তাহলে আমি কি করব জানেন ?'

'না হুজুর।'

'তাহলে, আমি সে চুল উপড়ে ফেলে দেবো।'

সুলতান অতঃপর কি করে তাঁর লক্ষ্য হাসিল করবেন, তার হিসাব করতে লেগে গেলেন। সে তো অনেক লম্বাচওড়া কাণ্ডকারখানা। এতো কথা বলার তো সময় নেই, স্থান নেই এখানে। বড় হয়ে তুমি সব খবর নিয়ো। আমি শুধু মোক্ষম দু' একটার কথা বলছি।

সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ ঠিক করেছেন তিনি কনস্টান্টিনোপল জয় করবেন, পৃথিবী জয় করবেন। তাঁর নাম হবে বিশ্বজয়ী মুহম্মদ। অতএব বিশ্বের কোথায় কি আছে তাঁর জানতে হবে।

facebook/@maktabatuttalamij

তিনি করলেন কি, লোক ঠিক করলেন। সেই লোক রোজ রোমান ইতিহাসের বই, ইউরোপ এশিয়ার অন্যান্য দেশের ইতিহাসের বই নিয়ে এসে পড়ে পড়ে শোনাতে লাগল সুলতানকে। দিনের পর দিন। সমস্ত বড় বড় যুদ্ধের কাহিনী। যুদ্ধের পরিকল্পনার খবর। সম্রাটের চরিত্র। উজিরের চরিত্র। দেশের আমলাদের কি করে তালিম দেওয়া হয়। কি করে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়। কি করে সৈন্য বানাতে হয়। সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখতে হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি..........।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুলতান জিজ্ঞেস করেন ইটালী ঠিক কোন জায়গায় ? তার উত্তরে কোন রাজ্য, দক্ষিণে কোন রাজ্য। নদীপথ আছে ? সমুদ্রপথ ?

ইউরোপের অন্যান্য দেশের অবস্থান কি রকম ? কোনটা তাদের শক্ত এলাকা, কোনটা দুর্বল স্থান? একটা মস্ত বড় ম্যাপ ছিল তাঁর কাছে।

facebook/@maktabatuttalamij

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি শুনে যান যুদ্ধের কলাকৌশলের কথা। ভিতরে তাঁর আগুন জ্বলে। তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। অসম্ভব। এর কোন মানে হয় না। সেই সাতশো বছর আগে থেকে, খলীফাদের সময় থেকে মুসলমানরা চেষ্টা করছে কনষ্টান্টিনোপল জয় করতে। কেউ পারেনি। বিশ্বাস হয় না। এটা লজ্জা। কেউ যদি চেষ্টা না করতো তাহলে কথা ছিল, কিন্তু চেষ্টা করে, মাঠে নেমে হেরে যাওয়া, সে ভীষণ বিশ্রী ! কনষ্টান্টিনোপল জয় করার, সমস্ত বিশ্বকে হাতের মুঠোয় আনার একটা অদম্য ইচ্ছার আগুনে তিনি নিশিদিন জ্বলতে লাগলেন।

তিনি মনে মনে বললেন, সমস্ত পৃথিবীতে রাজ্য থাকবে একটাই। এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক রাজা। তা করতে গেলে রাজধানীর জন্য কনষ্টান্টিনোপলই হবে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। জ্ঞানে গুণে সভ্যতায় এবং ভৌগোলিক অবস্থানে সেই মহান নগরীই হবে সত্যিকার কেন্দ্রস্থল। এই গেল খবর সংগ্রহ এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুপ্রেরণা সংগ্রহের ইতিহাস। আর কি করলেন ? অস্ত্র চাই ! ভালো, উন্নত অস্ত্র চাই !

ভালো অস্ত্র বানাতে চান তিনি।

কিন্তু তিনি নিজে তো কি করে ভালো অস্ত্র বানাতে হয়, কামান বানাতে হয় জানেন না। ভালো অস্ত্র বানানোর জন্য তাঁর দেশেও সেরকম ভালো কারিগর নেই। সুতরাং তিনি কি করলেন ? তিনি সুদূর জার্মান থেকে কারিগর আনলেন অস্ত্র বানাবার জন্য। তাদের অনেক টাকা মাইনে দিলেন, যাতে তাঁরা খুব ভালো করে কাজ করে। যাতে তাদের তৈরি অস্ত্র খুব কাজের হয়। তারপর পটাশিয়াম নাইট্রেট আর গন্ধক আনালেন বিদেশ থেকে। এই দুটো জিনিস দরকার হয় কামানের গোলাবারুদ বানানোর জন্য। আনলেন প্রচুর পরিমাণে তামা। বোমার গোলা তৈরির জন্য। সেই জার্মান কারিগরদের কথামতো সব জিনিস এনে হাজির করে সুলতান তাদের বললেন, 'তোমরা যা যা চেয়েছো সব কিন্তু আমি এনে দিয়েছি। এখন তোমরা ভালো করে বুঝে-শুনে ভালো অস্ত্র ভালো গোলা বানাবে, বলে দিলাম। কাজ যদি খারাপ হয়, যদি দেখি কোথাও গড়বড় হয়েছে, তাহলে মনে থাকে যেন, আগেও বলেছি এখনও বলছি,শূলে চড়াবো সবাইকে। যে অস্ত্র বানাবে, সে গোলা বানাবে সব দুশমনদের উপর আমি পরীক্ষা করব, মানে চালাব, ভালো হলো তো ভালো, নইলে তোমাদের গর্দান নেবো। ততদিন তোমরা থাকবে এই কর্মশালায় বন্দী। বুঝেছো ?'

'জি হুজুর, বুঝেছি শাহানশাহ সুলতান।'

facebook/@maktabatuttalamij

জার্মান কারিগর, দেশি কারিগর সবার উপর এক আদেশ।

তারপর কামান যা এক একটা বানালো না, ইয়া বড় ! দেখলেই ভয় লাগে। অসুবিধা হলো, এতো ঢাউস কামান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টেনে নেবে কি করে। যুদ্ধ জয় করে করে যতই রাজ্য জয় হবে, ততই সামনের দিকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে কামান।

তিনি হুকুম দিলেন, কামানকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হবে। এমন করে টুকরো করতে হবে যাতে টুকরোগুলো জোড়া দিলেই বিরাট কামান হয়, আবার খুললেই ছোট ছোট হয়ে যায়। খুব সুবিধা।

সমস্ত অস্ত্র তৈরি শেষ হলো!

গোলা বারুদ তৈরি হলো।

সুলতান নিজের পরিকল্পনায় খুব খুশি।

তিনি কনষ্টান্টিনোপল থেকে পাঁচ মাইল দূরে এক দুর্গ তৈরি করলেন। এক হাজার রাজমিস্ত্রি ও এক হাজার মজুর দিনরাত কাজ করে তিন মাসের মধ্যে শেষ করল সে কিল্লা। তাতে বসালেন বিরাট বিরাট সব দূর পাল্লার কামান।

তারপর সুলতান সমস্ত সেনাবাহিনীর প্রধানদের ডাকলেন। তখন তো প্রধানদেরই ডাকা হতো, প্রধানরা হুকুম দিতো তাদের নিচের জনকে। এমনি করে শৃঙ্খলা রক্ষা করা হতো।

প্রধানদের ডাকলেন, বললেন, 'যার যে কাজ সে কাজ সে করবে। যদি না করে, তার জন্য সে চরম শাস্তি পাবে। তোমাদের আমি বিশ্বাস করি, তবু তোমরা জানো, তোমাদের প্রত্যেকের সমস্ত খবর আমার জানা থাকে। তোমাদের প্রত্যেকের পেছনে আমার লোক আছে। অতএব, এ বিষয়ে আর বেশি বলার দরকার নেই।

'জি হুজুর, জি হুজুর, আমরা সব আপনার বান্দা, আপনার হুকুমের দাস।' 'মনে রেখো কনষ্টান্টিনোপল জয় করতে পারলে আমরা আছি, নইলে আমরা শেষ। হারলে আমি তোমাদের সবাইকে এই কামান দিয়ে উড়িয়ে দেবো—তারপর আমি নিজেও শেষ হবো।

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল সুলতান কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করলেন। অবরোধ মানে চারদিক থেকে ঘেরাও করলেন। কাউকে কোথাও যেতে দেবেন না। যুদ্ধ করো, পরাজিত হও, আত্মসমর্পণ করো, অর্থাৎ বলো, আমি হার মানলাম, নইলে আটকে রাখবো। কাউকে বের হতে

facebook/@maktabatuttalamij

দেবোনা। কেউ ভেতরে যেতে পারবে না। তোমাদের খাবার ফুরোবে একদিন, বাইরে থেকে খাবার আনতে হবেই, তখন তোমাকে যুদ্ধ করতে হবেই, নইলে হার মানতেই হবে। এই হলো অবরোধ।

সুলতানের পক্ষে ছিল তিন লাখ সৈন্য। জ্যানিসারি এক বিশেষ বাহিনীর নাম। জায়গীর দেওয়া হতো একদলকে, বেতনের বিনিময়ে, তাদের নাম ছিল মোসেল্লিমান। অনিয়মিত পদাতিক সৈন্য ছিল, তাদের নাম ছিল আজেব। বেতনভোগী অশ্বারোহী সৈন্যদের নাম ছিল সিপাহী। সব মিলিয়ে তিন লক্ষ। এর মধ্যে জ্যানিসারির সংখ্যাই ছিল বার হাজার। অপর দিকে কনষ্টান্টিনোপলের সৈন্য মাত্র ছয় হাজার।

প্রচণ্ড লড়াই হলো।

যুদ্ধে এক সময় দ্বিতীয় মুহম্মদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়।

তিনি দেখলেন, এতো আয়োজন করে এতো পরিশ্রম করার পর শেষ পর্যন্ত বুঝি হারই মানতে হয়। শত্রু পক্ষের এরা তো প্রচণ্ড বিক্রমে লড়াই করে তাদের প্রায় নাস্তানাবুদ করে ফেলেছে!

সুলতান দেখলেন, উপায় নেই। বসফরাস প্রণালী থেকে শত্রু পক্ষ তাদের তাড়িয়ে দিতে পারলে কনষ্টান্টিনোপল আর কোনদিন জয় করা হবে না। তখন তিনি আবার তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করলেন। তিনি তখন এক বুদ্ধি বের করলেন। (ম্যাপ খুলে দেখো, তাহলে ভালো বুঝতে পারবে)।

বসফরাস প্রণালী থেকে তার যুদ্ধের জাহাজগুলোকে যদি কোন রকম গোল্ডেন হর্ণের পোতাশ্রয়ে নেওয়া যায়, তাহলে বুঝি তবু জয়ের আশা থেকে যায়। কারণ তাহলে শত্রুর নৌবহর কিছুতেই তাদের প্রতিহত করতে পারবে না। কিন্তু তা কেমন করে নেবে? দীর্ঘ দশ মাইল পথ। তিনি হাল ছাড়লেন না। যা অসাধ্য তাই তিনি করবেন। সেই দশ মাইলের উপর তাঁর হুকুমে কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেওয়া হলো। তারপর সেই তক্তার উপর গরু মেষ ইত্যাদির চর্বি ছিটানো হলো। ভালো করে ঘষে সেটা পিচ্ছিল করা হলো। তারপর সেই চর্বি দিয়ে পিচ্ছিল করা কাঠের মসৃণ পথের উপর দিয়ে সাতাশিটি যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে এলেন গোল্ডেন হর্ণের পোতাশ্রয়ে। তা-ও এক রাতের মধ্যে। তারপর তিনি নদীর উপর বানালেন এক ভাসমান অর্থাৎ ভেসে-থাকা সেতু। সেতুর উপর রাখলেন সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভারী কামান। কামানের মুখ কনষ্টান্টিনোপল নগরীর

facebook/@maktabatuttalamij

দিকে। এতো কাছে থেকে কামানের গোলা দারুণ ক্ষতি করল নগরীর দেয়ালের। দেয়ালে ফাটল হলো, ভাঙন হলো। চললো যুদ্ধ প্রচণ্ড।

সেই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিলেন সম্রাট কনষ্টান্টাইন, বাইজেন্টাইন রাজ্যের শেষ সম্রাট। তিনিও কম ছিলেন না। অনেক সাহস আর শক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় মুহম্মদের বাহিনীর তিনি মোকাবেলা করেন অনেকদিন। বলেছিলেন, যদি রাজ্য না থাকে, 'যদি যুদ্ধে হেরে যাই তাহলে আমি আর জীবিত থাকতে চাই না।' শেষ পর্যন্ত তাই হলো। সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদের হাতে পতন হলো কনষ্টান্টিনোপলের।

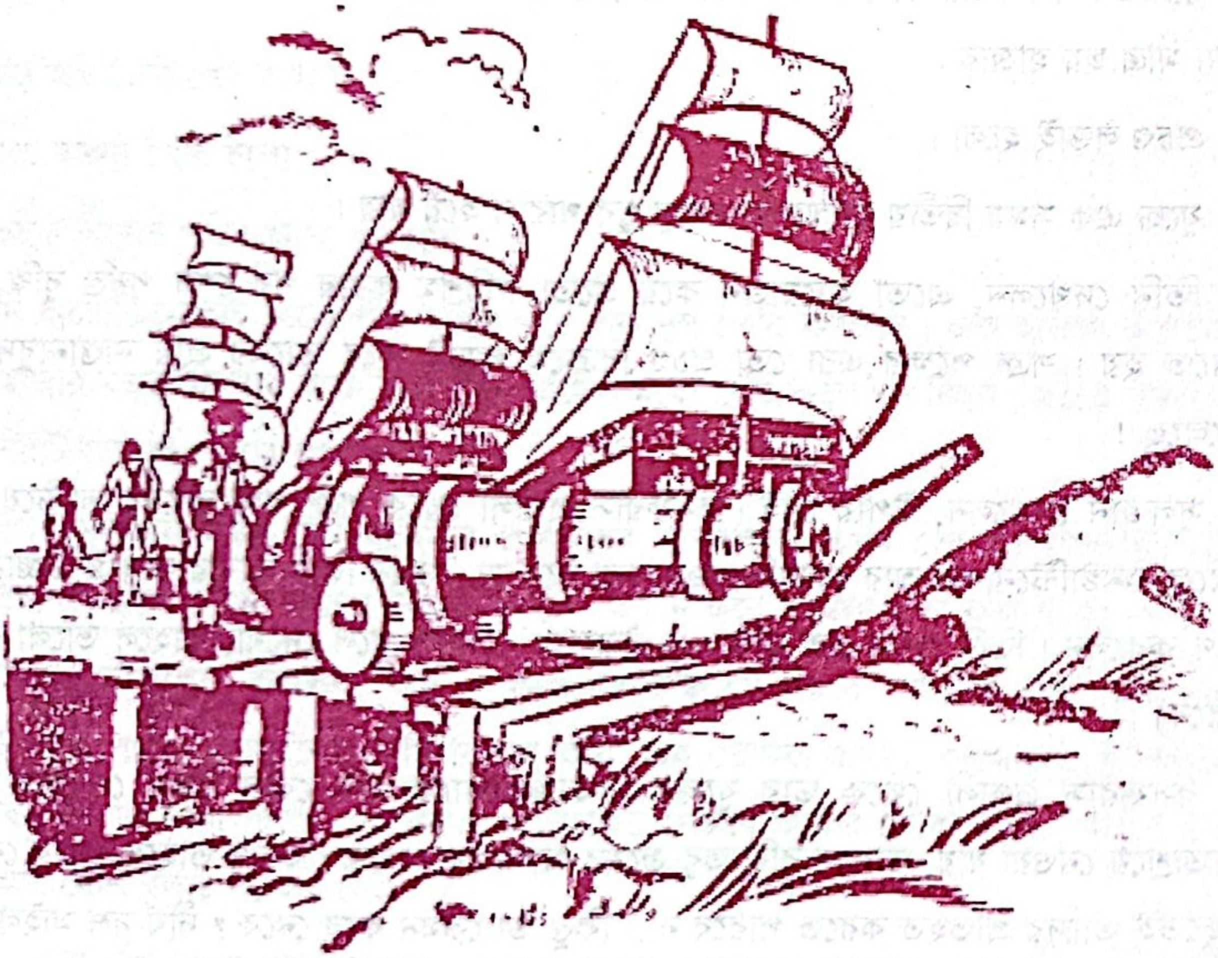

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল থেকে ২৯শে মে—চুয়ান্ন দিন; চুয়ান্ন দিন অবরোধের পর পতন হলো এক মহান নগরীর এক শক্তিশালী রাজ্যের।

২৮শে মে তারিখে শহরের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল। শান্তা সোফিয়া গির্জার ভিতরে ঝুলছিল ভৌতিক আলো। সেই বিরাট গির্জায় সে দিন সন্ধ্যায় শেষ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। কারণ ২৯ শে মে তারিখের সকালবেলা নগরীর বিধ্বস্ত দেয়ালে দেয়ালে পতপত করে উড়তে শুরু করল অটোমানদের পতাকা।

facebook/@maktabatuttalamij

সোজা কথা নয়, কতোদিনের পুরনো রাজ্য, কতো তাদের প্রতাপ! কতো গর্ব, কতো ইতিহাস। কতো স্মৃতি পূর্বপুরুষের। প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছিল সে দেশ, সে নগরী। সব তারা হারালো কার হাতে? একজন ক্ষুদ্র অটোমান সুলতানের হাতে। সেই সামান্য সুলতানের পরিচয় কি?

অটোমানরা আসলে তুর্কী জাতিরই অংশ। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনের পর থেকে এঁরা মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়ায় আসতে শুরু করে। কারণ পশ্চিম এশিয়ায় মুসলমান বেশি। সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রভাব বেশি। তারা অনেকে ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েও পশ্চিম এশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

আসলে এঁরা স্বভাবে যাযাবর ছিল তো—তাদের কাছে মধ্য এশিয়া পশ্চিম এশিয়া সব সমান। কাজেই পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান দেশে এসে তারা মুসলমানদের ভাড়া-করা সৈন্য হিসাবে লড়তে শুরু করল খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে। মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্টানদের প্রধান ঘাঁটি ছিল বাইজেনটিয়াম রাজ্য, যার রাজধানী ছিল কনষ্টান্টিনোপলে। এই এদের বিরুদ্ধেই ছিল এশিয়া মাইনরের ছোট ছোট সবগুলো মুসলমান রাজ্যের যত যুদ্ধ।

facebook/@maktabatuttalamij

ম্যাপ খুলে দেখো, উত্তরে কৃষ্ণ সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, মধ্যখানে এশিয়া মাইনর। এমনি একটা ছোট দেশ শাসন করতেন উসমান বেগ নামে এক সুলতান। উসমানের নামে জাতির নাম, উসমানী। ইউরোপের লোক ভালো করে উচ্চারণ করতে পারে না তো, বলে অটোমান। অটোমান দেশ, অটোমান জাতি—মানে উসমানী দেশ—উসমানী জাতি!

খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। জিতলে গাজী হওয়া যাবে, মরলে শহীদ! অনন্ত বেহেশতে কতো কি যে সুখ!

কাজেই পশ্চিম এশিয়া থেকে যাযাবর তুর্কীরা উসমানের খাতায় নাম লেখাল এসে। [দেখতে দেখতে বেড়ে চলল উসমানের খাতায় নাম লেখাল এসে।] দেখতে দেখতে বেড়ে চলল উসমানের রাজ্য। তারপর দ্বিতীয় মুহম্মদের সময় তো সে এক পেল্লায় কাণ্ড !

কি রকম পেল্লায় ?

আগেই বলিনি, কেউ যা পারেনি তা-ই পারবেন বলে পণ করেছিলেন সুলতান মুহম্মদ ? তাই তিনি করে ছাড়লেন শেষ ইস্তক। তাঁর সমস্ত পূর্বপুরুষের স্বপ্ন তাঁর হাত দিয়ে সত্য হয়ে গেলো। তিনি খুলে দিলেন ইউরোপের দরজা, মুসলমানদের জন্য।

অবশ্য যখন হাত করলেন তিনি কনষ্টান্টিনোপল, তখন তার শেষ দশা। অনেকদিন ধরে কনষ্টান্টিনোপল তার জৌলুশ হারাচ্ছিল। কিন্তু তবু এতো বড় একটা শহর। কতোকাল ধরে খ্রিস্টানদের রাজধানী তো ছিল বটে। সেটিই এখন হলো মুসলমানদের এক বিশাল রাজ্যের রাজধানী। কম কথা নয়। তাছাড়া, শান-শওকত কম থাকলে কি হবে, জলপথ বলো, স্থলপথ বলো, ব্যবসা বলো, বাণিজ্য বলো, সভ্যতা জ্ঞান বিজ্ঞান বলো, সব কিছুর কেন্দ্রস্থল ছিল এই নগরী, এই কনষ্টান্টিনোপল। অনেক অনেক বছর।

এই বিজয়ের ফলে সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদকে সবাই মিলে নাম দিলো বিজয়ী মুহম্মদ।

বিজয়ের পর মুহম্মদ নিজেই অবাক হলেন। কেউ পারেনি, তিনি কেমন করে পারলেন ? তার মানে, যেমন করে হিসাব করে প্ল্যান করে, কনষ্টান্টিনোপল জয় করেছেন তিনি, ইচ্ছে করলেই কি তিনি তেমন করে বিশ্ব জয় করতে পারবেন। এই নগরী যখন আনতে পেরেছেন নিজের হাতে, ইচ্ছা করলে তিনি আরো আনতে পারবেন। একদা যা ছিল রোমানদের, সব। তিনি যদি বিশ্ব জয় করেন, এই ইস্তাম্বুলই হবে তার রাজধানী।

facebook/@maktabatuttalamij

কনষ্টান্টিনোপলের নাম বদলে ইস্তাম্বুল রাখলেন তিনি। একদিকে গোল্ডেন হর্ন, অন্যদিকে মারমোরা সাগর। দুই জলধারার মধ্যখানে ইস্তাম্বুল।

বিশ্ব জয় করবেন তিনি।

কিন্তু তার আগে তিনি মন দিলেন রাজ্য রক্ষায়।

প্রথমেই রাজধানী। তিনি ঘোষণা করে দিলেন, ইচ্ছে করলে যে কেউ এখানে আসতে পারে। বসবাস করতে পারে। সব খরচ সরকারের। তাকে ইস্তাম্বুল শহরে ঘর দেওয়া হবে, বাড়ি দেওয়া হবে, বাগান, খেত খামার সব দেওয়া হবে।

তিনি শান্তা সোফিয়ার বিরাট গির্জাকে মসজিদ বানিয়ে ফেললেন। তারপর আরো চারটি মিনার যোগ করলেন এই নতুন মসজিদের সঙ্গে। সমস্ত ইস্তাম্বুল শহরে আরো অনেক মসজিদ স্থাপিত হলো। পুরনো রাজপ্রাসাদ তাঁর ভালো লাগল না। তিনি নতুন করে এক রাজপ্রাসাদ বানালেন, একেবারে শহরের মাঝখানে। নাম দিলেন তোপকাপি প্রাসাদ। বিরাট এলাকা জুড়ে, সে একেবারে ছোটখাট এক শহর।

তারপর তৈরি করলেন আরো অনেক দালান, বাড়ি, স্কুল, কলেজ স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি।

একদিকে ইস্তাম্বুল বাড়তে লাগল, অন্যদিকে রাজ্যও বড় হতে লাগল। সুলতান মুহম্মদ স্বপ্ন দেখেন তিনি বিশ্ব জয় করবেন। কিন্তু পারলেন না। মৃত্যু এসে তাঁকে বাধা দিল। তা হোক, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের স্বপ্ন সফল করে গেছেন, কনস্টান্টিনোপল জয় করে গেছেন। তাঁর স্বপ্ন সফল করবে তার পরবর্তী পুরুষ।

এটাই নিয়ম। একজনে সব পারে না, একজন যেখানে শেষ করে, আরেকজন সেখানে শুরু করে।

আসলেও তাই হয়েছিল।

তিনি আদর্শ পুরুষ হলেন তাঁর পুত্রের পুত্রের পুত্রের অর্থাৎ সুলায়মানের। বিজয়ী মুহম্মদের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন, তাঁর পুত্র বায়েজিদ ও নাতি সেলিমের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তা সফল হয়নি। বায়েজিদ ছিলেন সুলায়মানের আব্বু, বড্ড বেশি অস্থির থাকতেন—ভাবতেন সব কাজ এক সঙ্গে করে ফেলবেন। তর সইলো না, তিনি বড্ড তাড়াতাড়ি বিশ্ব জয় করতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর উপাধি হলো 'নিষ্ঠুর' এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর

facebook/@maktabatuttalamij

নিজের রাজ্যের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ করে ফেললেন, মক্কা ও মদীনা শরীফও তাঁর করতলগত হলো।

কিন্তু ওই যে বললাম, তিনি খুব তাড়াতাড়ি করছিলেন, তর সইছিল না, তিনি টিকলেন না। যুদ্ধ করতে করতেই তিনি মারা গেলেন। মাত্র আট বছর তিনি রাজত্ব করতে পেরেছিলেন।

তারপর এলেন সুলতান সুলায়মান।

আব্বাকে তার ভালো লাগতো না। কেমন ছন্নছাড়া, বেখেয়ালী তিনি। দাদা ভাই বায়েজিদও তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেননি। কিন্তু তারও আগে একজন ছিলেন, তার বড় আব্বা—মুহম্মদ। বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তিনি। সেই, তাঁকেই ভালো লাগতো তাঁর। ভীষণ ভালো বড় আব্বা, মুহাম্মদ সব স্বপ্ন যেন ছিল তার রক্তে। সেই পরিকল্পনা, সেই হিসাব, সেই কৌতূহল এবং সাহস। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেষ্টা করবেন, কেমন করে বড় আব্বা বিজয়ী মুহম্মদ এমন অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

পূর্বপুরুষ বিজয়ী মুহম্মদকে ভীষণ ভালো লাগতো তাঁর। কেউ যা করতে পারেনি। শতশত বছর ধরে তাই তিনি পেরেছিলেন। সেজন্যে অল্প বয়স থেকেই সুলায়মান মনে মনে তৈরি হচ্ছিলেন, তাঁর বড় আব্বার মতো তিনিও অসাধ্য সাধন করবেন। কাউকে ছাড়বেন না। সব দিক দিয়ে তিনি যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। রাজপুত্র হলে কি হবে, সমস্ত কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁর লেখাপড়া ও তালিম শেষ হয়েছিল। ছয় বছর তিনি পড়াশুনা করেছিলেন কনস্টান্টিনোপল। তাঁর শিক্ষক ছিলেন দেশের নামকরা শিক্ষক ও প্রশাসকবৃন্দ। সেই তখন থেকেই সবাই জেনে নিয়েছিল, সুলায়মান সাধারণ ছেলে নয়।

বালক সুলায়মানের যখন পনেরো বছর বয়স, তখন তাকে একটি প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। সে দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করলেন। শুধু তাই নয়, পিতার সাথে থেকে যুদ্ধও করেছেন এশিয়া মাইনরে।

কাজেই, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি যখন বিশাল অটোমান সুলতানাতের শাসনভার হাতে তুলে নিলেন, তখন রাজ্যে আনন্দের বন্যা নেমে এল। সমস্ত লোকজনের মনে স্ফূর্তি আর ধরে না। সবাই ভাবল, এবার দেশে সুদিন ফিরে আসবে।

রাজা ভালো হলে রাজ্য ভালো হয়, প্রজারা সুখে থাকে।

সুলায়মান সিংহাসনে বসে প্রথম কাজটি কি করেছিলেন জানো ? আব্বার আমলে কিছু লোককে অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছিল। তিনি যেভাবেই হোক জানতেন, লোকগুলোর কোন

facebook/@maktabatuttalamij

দোষ নেই। সুলায়মান সবার আগে তাদের নিজের হাতে ছেড়ে দিলেন। এটা হলো ন্যায় বিচার। বিচারে তিনি এখানে কোমল। আবার কঠিনও। কেমন ? তিনি জানতেন কিছু কর্মচারী ছিল ভীষণ দুর্নীতিপরায়ণ। দুর্নীতিপরায়ণ মানে, ঘুষ খেতো আর কি। আরো অনেক খারাপ কাজ করতো। তিনি সিংহাসনে বসেই আর কোন কথা নেই। চাকরি তো গেলই, আরো দারুণ শাস্তি দিলেন তাদের। জেল-জরিমানা কতো কি।

কিছু কর্মচারী ছিলেন খুব ভালোমানুষ। সৎ ও খুব কাজের। কিন্তু ওই অসৎ কর্মচারীদের পাল্লায় পড়ে তাঁরা কোন ভালো কাজ করতে পারতেন না। দুষ্ট কর্মচারীরা কেবল সুলতানের কাছে তাদের নামে নানারকম কান-কথা লাগাতো। সুলায়মান তাদের পুরস্কার দিলেন। প্রমোশন দিলেন। বেতন বাড়িয়ে দিলেন। জায়গীর দিলেন।

হ্যাঁ, ভালোর জন্য ভালো, খারাপের জন্য খারাপ।

সুলতান বুঝতেনও কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। নইলে তো সেই কান-কথাই শুনতে হতো। কান-কথাতেই কাজ করতে হতো।

সিংহাসনে বসেই এই যে রাজার মতো কাজগুলো করলেন, এতে খুব সুনাম হলো সুলায়মানের। ধন্য ধন্য পড়ে গেল। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এল।

কাজেই তখন তিনি রাজ্য জয়ে মন দিলেন। তিনিও দেখিয়ে দেবেন, কেমন করে পৃথিবী জয় করতে হয়।

সুলায়মান যখন সুলতান হলেন তখন সময়টাও তার জন্য খুব ভালো ছিল। পশ্চিম দেশে অর্থাৎ ইউরোপে তখন ভীষণ কোন্দল রাজায় রাজায়। একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না। অথচ সব রাজার ধর্ম ছিল এক। সবাই খ্রিস্টান। কাজেই ওরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে সবাই তখন বেশ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

রোমান সম্রাটের পঞ্চম চার্লসের রাজ্য ছিল বড় ছড়ানো ছিটানো, ফলে সবগুলো দেখাশুনা করা তার পক্ষে বড় মুশকিল ছিল।

এদিকে তখনই জার্মান দেশে এক পাদ্রীর আবির্ভাব হলো, নাম তাঁর মার্টিন লুথার।

মার্টিন লুথার খ্রিস্টান ধর্মকে নিয়ে একটা আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি বললেন, ধর্মের ভিতরে কিছু কিছু অনাচার মানে খারাপ জিনিস ঢুকেছে। এগুলো সাফ করতে হবে।

সাফ করতে হবে, সেটা তুমি বলার কে ? অন্য সব পুরনো পাদ্রীরা হেঁকে উঠল। কাজেই

facebook/@maktabatuttalamij

গোলমাল লেগে গেল। ভাগ হয়ে গেল ওরা। একদিকে রইল প্রটেস্টান্ট। অন্যদিকে ক্যাথলিক। সমস্ত ইউরোপ গেল লুথারের দলে, তারা প্রটেস্টান্ট হলো। প্রটেস্ট (Protest) মানে প্রতিবাদ। প্রতিবাদী, মানে নতুন; তারা বলল, রোমের ক্যাথলিক রাজাদের আমরা মানি না। ওই চার্লস আমাদের রাজা হওয়ার যোগ্য নয়। ১৫২১ সনে ঝগড়া হলো ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস আর রোমান সম্রাট চার্লসের মধ্যে। অতএব যুদ্ধ শুরু হলো দুজনের মধ্যে, ইউরোপের দুই বিরাট খ্রিস্টান রাজার মধ্যে।

সুলায়মান দেখলেন, ওরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছে। ওরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। তাঁদের আক্রমণ করলেন। আর যায় কোথায়।

দেখতে দেখতে সুলায়মান জয় করে নিলেন গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া। ম্যাপের দিকে তাকাও, দানিয়ুব নদী বের করো। মধ্য ইউরোপের থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে দানিয়ুবের—পড়েছে এসে কৃষ্ণসাগরে। সুলায়মান দেখলেন, ইউরোপে যেতে হলে দানিয়ুব নদী ধরে যেতে হবে। এই যে............... বুলগেরিয়া আর রুমানিয়া রাজ্য, দুটোই কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে-পশ্চিমে, দানিয়ুবের

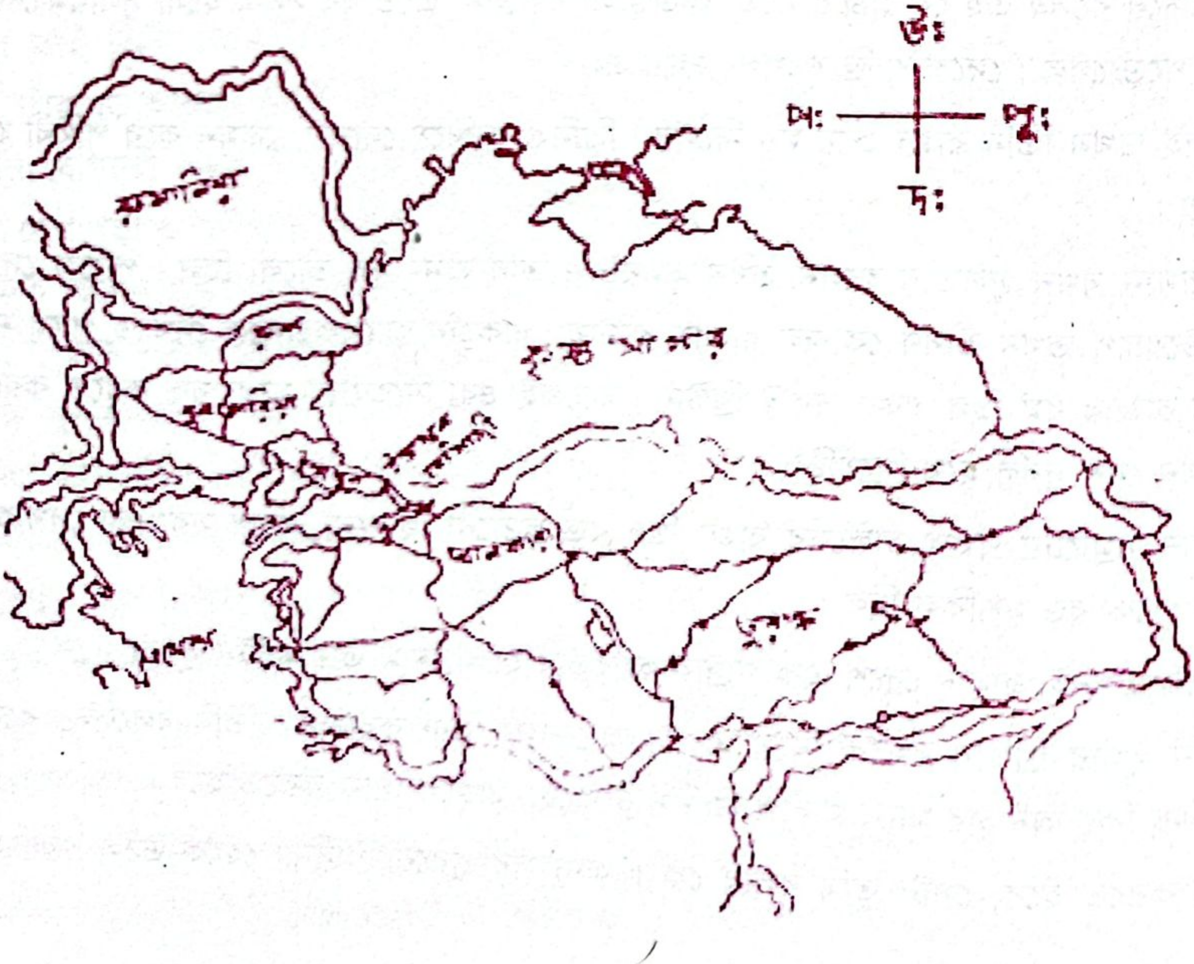

facebook/@maktabatuttalamij

দুই পারে অবস্থিত। এই দুটোই যখন সুলায়মানের হাতে চলে এলো, তখন বলা চলে, কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। খেলা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু হলে কি হবে! সামনে আর এক বিরাট বাধা।

বেলগ্রেড। বেলগ্রেডের দুর্গ।

ওখানে দুদিকে দুর্গম পাহাড়। বিপদ-সঙ্কুল! মধ্যখানে নদী দানিয়ুব। বেলগ্রেডে যত কঠিনই হোক না কেন, ইউরোপের ভিতরে প্রবেশ করতে হলে বেলগ্রেড চাই-ই-চাই। প্রতিজ্ঞা করে ফেললে প্রতিজ্ঞা পূরণ করতেই হবে।

অতএব বেলগ্রেড তিনি দখল করলেন। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরী ও মধ্য ইউরোপে ঢুকবার রাস্তা এখন প্রশস্ত ও নিষ্কন্টক।

এদিকে ওঁদের মধ্যে যে যুদ্ধ হচ্ছিল তার একটা ফলাফল হয়ে গেল। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসকে বন্দী করে ফেলল অষ্ট্রিয়ার রাজা পঞ্চম চার্লস। ফরাসীরা ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেল। ওরা এসে খুব করে ধরল সুলায়মানকে, বিস্তর কান্নাকাটি করল। বলল, এদের শাস্তি দিতে হবে।

বলল, 'হুজুর, ভিয়েনা আপনাকে আক্রমণ করতেই হবে, নইলে ওদের বাড় বেড়ে যাবে ভীষণ।'

সুলতান তাঁদের কথা রাখলেন। এবং এর ফলে সুলায়মানের রাজত্বকালে কোনদিন ফরাসীরা সুলতানের বিরোধিতা করেনি।

সুলতান সুলায়মান যত যুদ্ধ জয় করেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল দুটো। একটি বেলগ্রেড, অন্যটি মোহাক। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সুলায়মান যত যুদ্ধ করেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল, সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল মোহাকের যুদ্ধ।

হাঙ্গেরীদের বিরুদ্ধে হয়েছিল এই যুদ্ধ। হাঙ্গেরীয় মোহাকে। ভীষণ ভালো শক্ত অস্ত্রশস্ত্র ছিল হাঙ্গেরীর অশ্বারোহীদের পদাতিকদের।

কিন্তু হলে কি হবে, সুলতানের পদাতিক, জ্যানিসারি আর অশ্বারোহী সিপাহীদের কাছে দাঁড়াতেই পারল না। মোহাকের যুদ্ধে তারা নিদারুণ পরাজয় বরণ করল। যুদ্ধে নিহত হলেন হাঙ্গেরীর রাজা লুই।

মোহাকের যুদ্ধে সুলতান জিতলেন বটে। কিন্তু এদিকে আর এক বিপদ।

facebook/@maktabatuttalamij

এই বিজয়কে খ্রিস্টান ইউরোপ কিন্তু খুব ভালো চোখে দেখল না। বোধ হয় সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল প্রতিবেশী রাজ্য অষ্ট্রিয়ার। একেবারে নাকের কাছে তো (ম্যাপ দেখো) বিবাদ বেঁধে গেল অটোমান আর অষ্ট্রিয়ার মধ্যে।

সুলতান কি আর করবেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা আক্রমণ করতে হলো। আর সুলতানের আক্রমণ, সে তো জানা কথাই, কি রকম হবে। তিনি তো আর হঠাৎ কিছু করে বসেন না। সব হিসাব করে কোথায় কখন কে কি করবে সব আঁটঘাট বেঁধে তিনি আক্রমণটি করলেন।

এতো ভয়াবহ আর কঠিন সে আক্রমণ! সমস্ত ইউরোপ কেঁপে উঠল।

সারা ইউরোপের লোক হলো খ্রিস্টান। একজন মুসলমান সুলতান খ্রিস্টান ইউরোপের ভিতরে এসে এতো বাহাদুরি দেখাবে, এটা তারা খুব খারাপ চোখে দেখল। ওরা সব এক হয়ে গেল।

কথাটা ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করো। এটা কিন্তু একটা দারুণ খবর! মুসলমান একজন সুলতান ভিয়েনা আক্রমণ করলেন। দারুণ কঠিন সে আক্রমণ! সব কেঁপে উঠল।

তখন কিন্তু ইউরোপের রাজাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না খুব একটা। কিন্তু এই আক্রমণের ঠেলায় সব অস্থির হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে সব দুশমনি ভুলে গেল। কি, এতো বড় কথা ! একজন মুসলমান সম্রাট কিনা—হুঁ! সেই আটশো বছর আগে আরবের মুসলমানরাও এমনি হুঙ্কার মেরে এগিয়ে এসেছিল। ফ্রান্সের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল তারা। তখন ছিল এমনি ধারা বিপদ। আর এখন এতদিন পরে আবার এল এই অটোমান সম্রাট। আবার সেই মুসলমান !

সুলায়মান ভিয়েনা নিতে পারলেন না বটে, কিন্তু তাঁর ভয়ে খ্রিষ্টানদের সব রক্ত জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল!

সুলায়মানের বিশাল সৈন্যবাহিনী। বিচিত্র রং বেরংয়ের তাঁবু দিয়ে রচিত তাঁদের শিবির। সেই দিকে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখতো ভিয়েনার লোকজন। তাঁর বিরাট ক্ষমতার সামনে আপনা আপনি মাথা নুয়ে আসতো তাঁদের। শ্রদ্ধায়, ভয়ে।

সব খ্রিস্টান এক হয়ে গিয়েছিল ভিয়েনা আক্রমণের সামনে। তারা প্রাণপণে সুলতানের সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখছিল।

তবু সুলতান পিছু হটেননি। ভিয়েনা তিনি দখল করবেনই। দারুণ প্রতিজ্ঞার মানুষ ছিলেন তো!

facebook/@maktabatuttalamij

কিন্তু কি করবেন, এক নম্বর বৃষ্টি-বাদলা, ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস, যাকে বলে প্রচণ্ড দুর্যোগ। কাবু হয়ে গেল সুলতানের সৈন্যরা। দুই নম্বর, শত্রুরা সব মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তিন নম্বর, ভিয়েনার দেয়ালের কাছে আসতে তাদের অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। ততদিনে শীত নেমে গিয়েছিল।

অক্টোবরের মাঝামাঝি তারা ফিরে গেল ইস্তাম্বুলে। যদি গোঁয়ার্তুমি করতেন সুলতান, বলতেন, না এসেছি যখন হেস্তনেস্ত না করে যাবো না, তাহলে হয়তো কোনদিন আর ইস্তাম্বুলে ফিরতে পারতেন না তিনি। দুর্যোগে মারা যেতেন।

ঐতিহাসিকেরা কি বলেন, জানো ? বলেন, ভিয়েনার যুদ্ধে সুলতানের ছিল তিন শত্রু। ইউরোপ, খ্রিস্টান আর দুর্যোগ। দুর্যোগ মানে ঝড়-তুফান, বৃষ্টি-বাদলা, শীত-বরফ ইত্যাদি।

কিন্তু তবু এখানে একটা দারুণ মজার ব্যাপার হয়েছিল। এটা অবশ্য জানা না জানা সমান কথা। তবে বলছি এজন্য, এরকম ঘটনা সবার জীবনে অনেকবার ঘটতে পারে। ভিয়েনার বিরুদ্ধে সুলায়মানের আক্রমণ এতো কড়া ছিল যে সমস্ত ইউরোপে তা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল।

জার্মানীর মার্টিন লুথার যিনি প্রটেস্টান্ট মতবাদ বার করলেন, তিনি কি বললেন জানো ? তিনি বললেন, তুর্কীরা ঈশ্বরের (মানে তাদের ঈশ্বরের) সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু। এমনি মারাত্মক আক্রমণের মুখে, ভিয়েনাকে যখন সুলায়মান দুই সপ্তাহ অবরোধ করে রাখলেন, সুলায়মানের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের চাপে ভিয়েনার যখন শেষ দশা, তখন ভিয়েনা কিন্তু আর টিকতে না পেরে সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ভিয়েনা প্রস্তুত হচ্ছিল, সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের উপায় নেই।

কিন্তু ঠিক তখনই সুলতান তার অবরোধ প্রত্যাহার করলেন। মানে সৈন্য উঠিয়ে নিয়ে গেলেন আর কি। ভিয়েনার যে শেষ-দশা তা তো তিনি জানতেন না। জানলে, শত দুর্যোগ হোক, সৈন্যরা ঠাণ্ডায় যত কাবু হোক, তিনি ছাড়তেন না। কিছুতেই ছাড়তেন না। দুর্যোগে শত্রু পক্ষের অবস্থার খবর পর্যন্ত নিতে পারেননি, তাই।

তাহলে ঘটনাটা ছিল কি ? সুলতান যুদ্ধে হারেননি। তিনি বুঝতেই পারেননি যে তিনি বিজয়ী।

তাছাড়া ওখানে রাজত্ব স্থাপন করা তাঁর উদ্দেশ্য তো ছিল না। তিনি কেবল চেয়েছিলেন হাঙ্গেরীকে ঠাণ্ডা করবেন, পঞ্চম চার্লসকে বেয়াদবির জন্য শায়েস্তা করবেন।

অনেক যুদ্ধ করেছেন সুলতান সুলায়মান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে। তিনি নিজে তেরোটি প্রধান যুদ্ধে তুর্কী বাহিনীর পরিচালনা করেছিলেন। যুদ্ধ করেছেন সমুদ্দুরে, যুদ্ধ করেছেন স্থলে।

facebook/@maktabatuttalamij

ভূমধ্যসাগরে যত যুদ্ধ করেছেন তিনি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব ছিল খায়রুদ্দিন বারবাডোসা নামে এক নৌ সেনাপতির। তিনি এতো দুর্ধর্ষ ছিলেন, স্পেনের সব লোক তাকে চিরকাল দস্যু বলে এসেছে। অবশ্য দস্যু তিনি ছিলেন প্রথম জীবনে। কিন্তু তবু শেষে সেনাপতি হওয়ার পরও তাকে দস্যু বলে ডাকতো তারা। কারণ পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে সুলায়মানের দল স্পেনের ব্যবসা-বাণিজ্যে দারুণ ক্ষতি করেছিল।

অবশ্য সুলায়মানের জীবদ্দশায় ভূমধ্যসাগরে কার দাপট বেশি, তা চূড়ান্তভাবে ঠিক হয়নি। ঠিক হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর চার বছর পর। এক তুমুল যুদ্ধে তুর্কীরা সাইপ্রাস অধিকার করে নেয়। এতেই ভূমধ্যসাগরে কায়েম হলো তাদের প্রভুত্ব।

সুলতান সুলায়মান কেবল খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কিন্তু সত্য নয়।

ভারত মহাসাগরের ভিতর দিয়ে অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। এগুলো শত শত বছর ধরে মুসলামানদের হাতে ছিল। মাঝখান থেকে পর্তুগীজরা এসে মুসলমানদের অবস্থা কাহিল করে দিল।

সুলতান সুলায়মান ওখানে একটি নৌ-বহর পাঠালেন মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য। কিন্তু তাতেও কিছু হয়নি। পর্তুগীজদের ভারত মহাসাগর থেকে সরানো গেল না। কারণ তাদের নৌশক্তি খুব শক্ত ছিল। সাগরের প্রভুত্ব থাকে তার কাছে, যে ভালো শক্ত জাহাজ বানাতে পারে, উত্তাল সমুদ্রে যার জাহাজ হেসে-খেলে ভাসতে পারে।

মুসলমানরা সে রকম জাহাজ বানাতে পারেননি, কাজেই হঠাতে পারেনি পর্তুগীজদের। সেরকম জাহাজ পরবর্তীকালে বানিয়েছিল ইংরেজ আর ডাচ নৌ-কারিগররা। কাজেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছিলেন পর্তুগীজদের।

কেবল বাহুবলে হয় না—বিদ্যা লাগে। বুদ্ধির দরকার হয়। তারপর সুলায়মান পারস্য আক্রমণ করলেন। পারস্য ছিল মুসলিম দেশ। দু'দেশের মধ্যে ছোট-খাট কলহ, হিংসা ও শত্রুতা লেগেই ছিল। একবার সে শত্রুতা চরম আকার ধারণ করল।

সুলতান নিজে তখন হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন ওখান থেকে তিনি চলে এলেন। ঘরের কাছে যে শত্রু, তাঁকে তিনি আগে দেখে নেবেন। যুদ্ধ হলো দুই মুসলিম শক্তির মধ্যে। সুলতান সুলায়মান জয়লাভ করলেন। তিনি বাগদাদ ও তাবরিজ অধিকার করে অনেকদিন ওখানে ছিলেন।

facebook/@maktabatuttalamij

তারপর তিনি তিউনসি, ত্রিপলী, এডেন, ইয়ামেন ও ওরান এবং ভূমধ্যসাগরের অনেকগুলো দ্বীপ দখল করে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর পার্শ্ববর্তী সমস্ত উপত্যকায় সুলয়মান তার অধিকার মজবুত করেন। তাহলে বুঝতেই পারছেন কতো বড় ছিলো রাজ্য।

কিন্তু হলে কি হবে, মনের শক্তি এক জিনিস, দেহের শক্তি এক জিনিস। সুলতান বুড়ো হয়ে গেছেন। দ্বিতীয়বার যখন পারস্য আক্রমণ করেন, তখনই তার বয়স ষাট। স্বাস্থ্য তার খুব একটা ভালো ছিল বলা যায় না।

কিন্তু শরীর খারাপ হলে কি হবে, কর্তব্য কর্তব্যই। তখন তাঁর বয়স সত্তর। হাঙ্গেরীর রাজা ফার্ডিনান্ড মারা গেলেন। তাঁর রগচটা পুত্র দ্বিতীয় ম্যাক্সিমিলান তাঁকে কর দেওয়া বন্ধ করে দিলেন।

কেবল খাজানা দেওয়াই বন্ধ করলেন না, নবীন রাজা প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতান সুলায়মানের রাজ্য আক্রমণ করে বসলেন।

দেখো, কেমন আস্পর্দ্ধা!

সুলতান আর কি করবেন, বাধ্য হয়ে শেষ বয়সে তাঁকে যুদ্ধে নামতে হলো। এটি ছিল হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে তাঁর সপ্তম অভিযান। ঝড় বৃষ্টি ছিল। তবু তিনি শেষ শক্তি নিয়োগ করে হাঙ্গেরীর সর্বশেষ দুর্গটি দখল করলেন। সে দুর্গের নাম মিজেত।

এই বিজয় শেষ হলো, মনে হলো সুলতানের কর্তব্যও শেষ হলো। যেদিন বিজয় শেষ হলো সেই রাত্রেই হঠাৎ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সুলতান সুলায়মান তুর্কী সিংহাসনে বসে সর্বপ্রথম বেলগ্রেড দখল করে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিলেন। এই হাঙ্গেরী বিজয় সম্পূর্ণ সমাধা করে পরে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। একশো বছর ধরে এই হাঙ্গেরী তুরস্কের অধীনে একটি প্রদেশ ছিল।

তাঁর নামে রাখা বিখ্যাত সুলায়মানী মসজিদ। তারই পাশে আছেন তিনি এখনো শায়িত।

এই যে এতোক্ষণ আমরা সুলতান সুলায়মানের কথা শুনলাম, এতে কি প্রমাণ হলো?

প্রমাণ হলো সুলতান সুলায়মান, যা করতে চেয়েছিলেন, তা করতে পেরেছিলেন। বিশ্বজয় করতে চেয়েছিলেন, বিশ্বজয় করেছিলেন।

facebook/@maktabatuttalamij

একজন মানুষকে দিয়ে একটা জাতির বিচার হয়েছিল। সুলতান সুলায়মানকে দিয়ে তুর্কী জাতির পরিচয় হলো, মুসলমান জাতির পরিচয় হলো। পৃথিবী জানলো—না, মুসলমান, সে সাংঘাতিক জিনিস। যেমন শক্তি তেমন সাহস, তেমনি জ্ঞান, তেমনি চরিত্র। ওরেব্ বাবা!

কেমন করে হলো ?

কেমন করে সুলতান সুলায়মান যা চেয়েছিলেন, তা করতে পারলেন ? প্রথমে তিনি খবর নিলেন। যা তিনি চান এমন কাজ তার আগে কেউ করেছেন কিনা, করে থাকলে কেমন করে করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলেন তাঁর বড় আব্বাকে, দাদাভাইয়ের আব্বাকে, দ্বিতীয় মুহম্মদকে। তিনিই তো পথ দেখিয়ে গেছেন, কেমন করে করতে হবে। কাজেই যে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বড় আব্বা সুলতান মুহম্মদ, সেই একই প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন সুলায়মান।

খবর নিলেন কোন রাজ্য কোনখানে। কি তার সুবিধা অসুবিধা ? কোথায় সে শক্ত, কোথায় দুর্বল ? কোনখানে আক্রমণ করলে আর নিস্তার পাবেনা। কতটুকু তার শক্তি ? সে শক্তিকে কাবু করতে কি পরিমাণ শক্তির দরকার ? ইত্যাদি।

খবর নিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র তৈরি করতে লাগলেন। অবশ্য খবরও এক রকমের অস্ত্র।

আসলে সংবাদ যে কতো বড় অস্ত্র, তা বড় হলে তোমরা নিজেরাই টের পাবে। আমি শুধু এইটুকু জানিয়ে দিলাম, খবর এক মারাত্মক অস্ত্র। যে যত বেশি খবর রাখবে, সে তত বেশি শক্তিশালী থাকবে। সে অস্ত্রে শান দেওয়া চলল, অর্থাৎ খবর সংগ্রহের কাজ চলল, আর অন্যদিকে চলল অন্যান্য অস্ত্র তৈরি ও সংগ্রহের কাজ। আর কি অস্ত্র ?

দুই নম্বর অস্ত্র জনশক্তি। মানুষ। ভালো মানুষ। কঠিন মানুষ। ভোঁতা ব্লেডে নোখ কাটা যায়? নোখ তো দূরের কথা, চামড়া পর্যন্ত কাটা যায় না। কাজেই কেউ তাকে পরোয়াও করে না। যেমন খুশি যে খুশি হাতড়ায়।

আর ধার ব্লেডে ? নতুন ব্লেডে ? ওরে সর্বনাশ! সাবধান! একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কি, কোনদিক দিয়ে কেটে যাবে টেরই পাবে না।

ব্লেডে না হয় বুঝলাম, ধার থাকলে সাবধানে হাতড়াতে হবে। কিন্তু মানুষ তো ব্লেড নয়। তার আবার ধার কিসের ?

facebook/@maktabatuttalamij

আছে, আছে। শান দিলেই ধার হয় তো ? মানুষেরও শান দেওয়া যায়। প্রশিক্ষণ, বিদ্যার্জন, জ্ঞানার্জন, কৌশল-শিক্ষা, যুদ্ধ বিদ্যা, শক্তি সাহস, চরিত্র এগুলো হলো মানুষের ধার।

কিন্তু এগুলো মানুষকে কি করে দেওয়া যায় ? আরে, এগুলো যদি দেওয়াই যেতো তাহলে আর আমরা কি এমন পিছিয়ে থাকি, সেই সুলায়মানের মতো বেরিয়ে পড়তাম না!

এখনো তুমি পারবে।

ওরা কেমন করে মানুষকে ধার দিতো, মানুষকে যন্ত্র বানাতো, মানুষকে সৈন্য বানাতো, মানুষকে মন্ত্রী বানাতো, মানুষকে অফিসার বানাতো, তা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

প্রথমে বলি সৈন্যদের কথা। কারণ লক্ষ্য যখন রাজ্য জয়, সৈন্যই তো চাই প্রথমে। ভালো ভালো সৈন্য। সেই ভালো সৈন্য এবং খুব কড়া সংগঠন সুলতান সুলায়মানের ছিল। সমস্ত পৃথিবী জানতো সুলায়মানের মতো এতো ভালো সৈন্য আর কারো নেই। সুলতানের অনেক রকম সৈন্য ছিল তো, অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ। সবার ট্রেনিং হতো। কিন্তু সবার কথা এখানে বললে তো অনেক সময় লাগবে। আমি তাড়াহুড়ো করে কেবল একদল সৈন্যের কথাই বলব।

তাদের নাম ছিল জ্যানিসারি।

জ্যানিসারি মানে তুর্কী ভাষায় 'ইয়ুনী সেরী'। যার অর্থ 'নতুন সেনাবাহিনী'।

এই জ্যানিসারির তালিকায় পয়লা নামটিই ছিল সুলায়মানের। তিনি বিশ্বাস করতেন, (এবং প্রতিদিন জোরে জোরে আবৃত্তি করতেন)

সেনাবাহিনী ছাড়া কোন সরকার হয় না।

অর্থ ছাড়া সেনাবাহিনী হয় না।

প্রজা-সাধারণ ছাড়া অর্থ সমাগম হয় না।

অতএব ভালো সৈন্যদের দলের প্রথম ব্যক্তি হলেন সুলতান স্বয়ং। যাতে তার পরে যাঁদের নাম থাকবে, সবাই কমবেশি সুলতানের মতো শক্তিশালী হয়, বুদ্ধিমান হয়, কুশলী হয়, সাহসী হয়।

ভালো মানুষ, ধারওয়ালা মানুষ, তুখোড় সৈন্য কি করে বানাতেন তাঁরা বলছি।

প্রথমে হুকুম হতো, ইস্তাম্বুল থেকে অমুক অফিসার যাবে আগামী মাসের পাঁচ তারিখে, অমুক

facebook/@maktabatuttalamij

জায়গায় জ্যানিসারি পছন্দ করতে। সঙ্গে যাবে অমুক কেরানী। ব্যস, নির্ধারিত দিনে ওরাঁ নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যেতেন-সঙ্গে থাকতো, যতজন জ্যানিসারি নিয়োগ করা হবে তত সেট জামা-কাপড়। হাতে উপযুক্ত সময় নিয়ে তাঁরা রওয়ানা হতেন, ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পৌঁছুতেন। তা সে জেলার একেবারে শেষ প্রান্তই হোক আর সদরই হোক। ওখানে গিয়ে ডাকতেন জেলার বড় অফিসারকে। সে অফিসার তার সমস্ত সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জড়ো হতো। তারপর চলতো প্রত্যেক খ্রিস্টান বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মাপজোক। কতো ফুট লম্বা, বুকের ছাতি কতো ফুট চওড়া। তারপর সব দেখে শুনে নিয়ে আসা হতো দশ থেকে বারো বছর বয়সের এই সব ছেলেদের ইস্তাম্বুল সুলতানের কাছে। সুলতান নিজে সবাইকে দেখতেন, ওদের প্যারেড করানো হতো সুলতানের সামনে। দেখে শুনে কাউকে যদি সুলতানের মনে ধরতো, তাকে রেখে দিতেন, রাজপ্রাসাদে নিজের কাজে।

ডাক্তার হাজির থাকতো কিন্তু হাতের কাছেই। দশ বারো বছরের বালকদের ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসার পরপরই ডাক্তার তাদের তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতেন দেখতেন কার কি রকম স্বাস্থ্য, কি রকম মানসিক অবস্থা। কার কি রকম মেধা। তিনিই দেখে-শুনে বলে দিতেন, কে থাকবে রাজপ্রাসাদে রাজার কাজে, কে থাকবে উজিরদের কিংবা অন্যান্য অফিসারদের কাজে। আর যাদের দেখা যেতো মেধার দিক থকে খুব আশাপ্রদ নয়, তাদেরকে রাখা হতো স্থানীয় জমিদারদের হাতে। সাময়িকভাবে। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত রাখবার জন্য। এই আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের ভীষণ দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে বড় হতে হতো। সব রকম জীবনে তাদের অভ্যস্ত হতে হতো। তারপর আঠারো বছর বয়স হয়ে গেলে আবার ইস্তাম্বুলে এনে তাদের জড়ো করা হতো। এদের মধ্যে যারা খুব তাগড়া থাকতো, খুব চটপটে, তাদের জ্যানিসারি সৈন্যদলে ভর্তি করা হতো। সেই সব তরুণ জ্যানিসারিদের দেওয়া হতো প্রবীণ জ্যানিসারিদের সঙ্গে। কাজ শেখার জন্য।

প্রবীণ জ্যানিসারিরা নবীন জ্যানিসারিদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাতেন। লক্ষ্যভেদ, তরবারি চালনা, তীর চালনা, অস্ত্রচালনা। কেমন করে খন্দক পার হতে হয়। কেমন করে দেয়াল টপকাতে হয়। প্রবীণ জ্যানিসারির সব হুকুম মানতে হতো তাদের। তা সে হুকুম যত খারাপ কাজের জন্যই হোক না কেন। তারা প্রবীণ জ্যানিসারিদের জন্য রান্না করতো, জঙ্গল থেকে লাকড়ি কুড়োতো। সব কাজ করতো শান্তির সময়ে। আর যুদ্ধের সময় তাঁবু খাটাতো, ঘোড়া কি উটের দেখাশুনা করতো। যুদ্ধে লাগিয়ে দিলে তাদের লক্ষ্য হতো কে কার চেয়ে বেশি বীরত্ব দেখাতে পারে। কে বেশি শৌর্য-বীর্য দেখাতে পারে। কে কার আগে মরতে পারে !

facebook/@maktabatuttalamij

অমনি অমনি তাদের কোনদিন প্রমোশন হতো না।

অনেক যুদ্ধ করার পর অনেক যুদ্ধে অনেকবার কৃতিত্ব দেখানোর পর যখন বোঝা যেতো তার মধ্যে সততার অভাব নেই, সাহসের অভাব নেই, তখনি তাদের প্রমোশন দেওয়া হতো—প্রধান জ্যানিসারির খাতায় নাম উঠতো তাদের।

এমনি বারো হাজার ছিল সুলতানের জ্যানিসারি বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা। তখনকার দিনে এই বাহিনীর গুণে সুলতানের সেনাবাহিনী ছিল দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী।

এ তো গেল সৈন্য জ্যানিসারির কথা।

আর যে সব জ্যানিসারিকে সুলতান পছন্দ করতেন, রেখে দিতেন প্রাসাদের কাজে, তাদের ট্রেনিং?

সে ট্রেনিংও ছিল ভীষণ কড়া। অনেক লম্বা ছিল সে ট্রেনিং। অনেক কিছু তাদের জানতে হতো। অনেক কিছু তাদের শেখানো হতো।

জ্যানিসারিতে ভর্তি করার পর তাদের চার রকমের স্কুলে পড়াশুনা করতে হতো এবং অন্যান্য বিষয় শিখতে হতো।

প্রথম স্কুলে তাদের শেখানো হতো তুর্কী ভাষা। ইসলাম ধর্মের নিয়ম-কানুন শেখানো হতো একই সঙ্গে। আরবী ভাষায়। পাঁচ-ছয় বছর চলে যেতো একই স্কুলে।

তারপর শুরু হতো দুই নম্বর স্কুল। ওখানে হতো ভাষা শিক্ষা। নিয়মিত ব্যায়াম, শারীরিক কসরৎ। কুস্তি। তীর চালনা। অসি চালনা। অন্যান্য অস্ত্রবিদ্যা। যুদ্ধ কৌশল সম্বন্ধে পড়াশুনা। দেশ বিদেশের বড় বড় যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ। এখানেও পাঁচ ছয় বছর। এই বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হতে হতে জ্যানিসারিরা কিন্তু রীতিমতো শক্ত সমর্থ যোয়ান মানুষে পরিণত হয়ে যেতো।

তিন নম্বর স্কুলে প্রবেশ করতো তারা অতঃপর। এই অংশের মূল কথা ছিল সামরিক তালিম এবং কোন একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ। অর্থাৎ এমন কিছু শেখানো হতো যা দিয়ে পরবর্তীকালে জ্যানিসারি কোন একটি বৃত্তিতে বা পেশায় ঠেকার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। অবশ্য সামরিক প্রয়োজনেই। ধরো, হঠাৎ করে এমন এক পরিস্থিতিতে পড়া গেল, একটা পোল না বানালেই নয়। এখন বাইরে তো সব শত্রুর এলাকা। পোল বানাবে কে? জ্যানিসারিদের মধ্যে এমন কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবেই, যে ওই কর্মে পটু। ট্রেনিং রয়েছে যে!

facebook/@maktabatuttalamij

অবশ্য এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা, এটাও সেই সুলতানের চাকরীর স্বার্থেই তো দেওয়া হতো।

একটা কথা বলা দরকার।

এই যে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, জ্যানিসারিদের, এরা কিন্তু সব খ্রিস্টান। খ্রিস্টান বাবা-মার ছেলে তো, তাই। ওদের ওখান থেকে ট্যাক্স হিসেবে এনে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, ওরা কিন্তু খ্রিস্টানই থেকে যেতো। জোর করে ধর্ম বদল করা যায় না তো ! কিন্তু এই সময় তাদের মধ্যে বিস্তর ধর্মমত বদল হতো। নিজেরাই বদলে নিতো। কাজের সুবিধার জন্য। তাছাড়া মুসলমান হলেই রাজপুরুষ হওয়া যেতো। আর কোনো কথা নেই। অনেকেই হতো এই বিবেচনায়। কিন্তু খ্রিস্টানী ছেড়ে মুসলমান হলেই তো হলো না। দেখতে হবে, তারা নতুন ধর্মে টিকবে কিনা। এই সময়ে, তিন নম্বর স্কুলে পড়া শেষ করার সময় দেখা হতো, নবীন মুসলমান জ্যানিসারি মুসলমান থাকবে কিনা। যদি দেখা যেতো না, শক্ত মুসলমান, তবেই তাকে চার নম্বর স্কুলে নিয়ে আসা হতো।

অবশ্য পরের দিকে জ্যানিসারি হিসাবে মুসলমান ছেলেদেরও নেওয়া হতো। তখন আর এইসব পরীক্ষার ঝামেলা থাকতো না।

চার নম্বর স্কুলে ঢুকতেই তাদের মাইনে যেতো বেড়ে।

সুতী কাপড়ের বদলে তারা রেশমী কাপড় পেতো। টোপরে তামার পাতের জায়গায় উঠতো সোনার পাত। রাতারাতি সম্মান বেড়ে যেতো তাদের। একেবারে সোনার কাঠি রূপোর কাঠির ব্যাপার আর কি! ওদের ভিতর থেকেই সুলতান নিজের বিশ্বস্ত লোক ঠিক করতেন। বিশ্বস্ত অনুচর, দেহরক্ষী, মন্ত্রণাদাতা বেছে নিতেন।

কঠিন প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে জ্যানিসারিদের রাজ-দরবারের জন্য কর্মচারী নির্বাচন করা হতো। প্রশাসনের বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে এরাই থাকতো। সেনাবাহিনীতেও তারা থাকতো।

ঘাটে ঘাটে এতো ভালো ভালো কর্মচারী ছিল বলেই তো সুলতান এতো বড় বড় কাজ করতে পেরেছিলেন। এতো যুদ্ধ জয় করেছিলেন। কোথাও পরাজিত হননি।

জ্যানিসারিদের ভেতর থেকে নির্বাচিত রাজ-কর্মচারী ও রাজপুরুষেরা সবকিছু দেখাশুনা করতেন। ফলে, সর্বত্র সুচারু শৃঙ্খলা দেখা যেতো। তা সে রাজদরবারেই হোক কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক। কোথাও কোন উচ্চবাচ্য নেই। নিঃশব্দে সর্বত্র সব কাজ ছবির মতো করা হতো।

facebook/@maktabatuttalamij

মনে হতো যা কিছু করা হচ্ছে প্রকাশ্যে, তার সবকিছুর জন্য যেন আগে থেকে রিহার্সেল দেওয়া ছিল।

রাজ দরবারে সুলতান সিংহাসনে বসে আছেন। নিচু সিংহাসন। মাটি থেকে মাত্র এক ফুট উঁচু। নানা মণি-মাণিক্যে সজ্জিত, নানা মূল্যবান বস্ত্রে শোভিত সিংহাসন।...............

দরবার ভর্তি লোকজন। সবাই এখানে এসেছেন আপন গুণে। তদবিরের জোরে অথবা বংশের মাহাত্ম্যে কেউ দরবারে স্থান পেতো না তো! কাজেই দরবারের সব সভাসদ এবং কর্মচারী

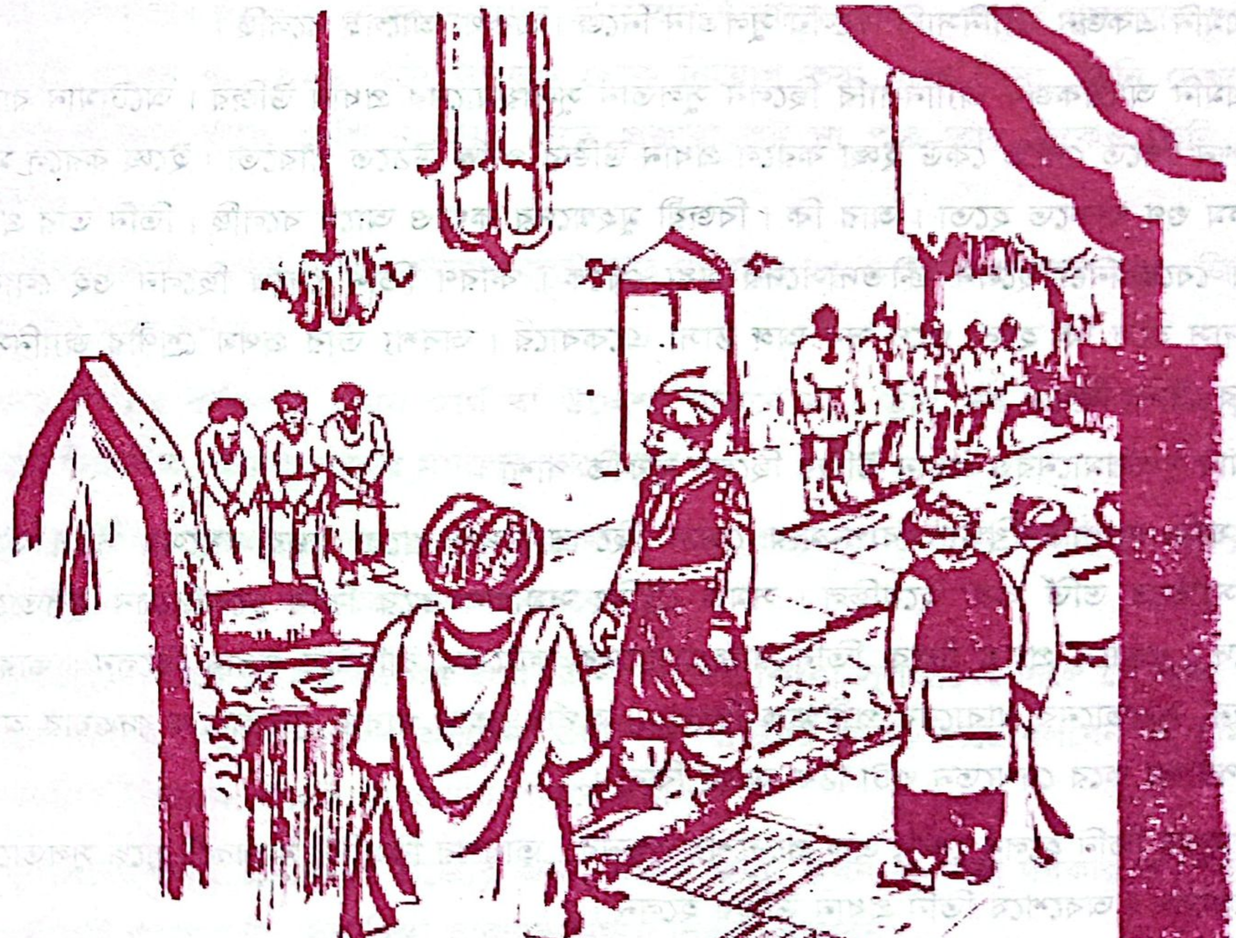

সবার চোখেমুখে থাকতো একটা বলিষ্ঠ তেজ। নিজস্ব ক্ষেত্রে এখানে কেউ কারো চেয়ে কম নয়। সবাই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সভার কাজ শুরু করার আগে সবখানে নীরবতা। কোন হৈ চৈ নেই। দরবারের সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে একপাশে একটি দলের উপর। ওরা জ্যানিসারি। দীর্ঘ কাতারে সারিবদ্ধ

facebook/@maktabatuttalamij

অবস্থায় দাঁড়ানো। কোথাও একটু নড়াচড়া নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, ওগুলো একটা সাজানো জড় বস্তুর সারি। মনে হবে কতোগুলো মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। মূর্তিগুলো মূর্তিই কিন্তু আসলে।

তারপর যেই এক সময় কোন বিদেশী কি দেশী গণ্যমান্য ব্যক্তি দরবারে প্রবেশ করেন, নকীব তাঁর আগমন বার্তা ঘোষণা করেন।তখনই তাঁরা সবাই একযোগে স্যালুট করে ওঠে। মূর্তিগুলো তখন নড়ে ওঠে। তখনই বোঝা যায়, ওরা আদেশে মূর্তি হয়, আদেশে সামান্যতম শব্দ করে কিংবা নড়াচড়া করে।

এমনি একজন জ্যানিসারি ছিলেন সুলতান নিজে। একথা আগেই বলেছি।

এমনি আরেকজন জ্যানিসারি ছিলেন সুলতান সুলায়মানের প্রধান উজির। অটোমান রাজ্যে প্রমোশন পেতে পেতে কেউ ইচ্ছা করলে প্রধান উজির পর্যন্ত উঠতে পারতো। ইচ্ছে করলে মানে সেরকম গুণ থাকতে হতো। আর কি। বিজয়ী মুহম্মদের কথাও আগে বলেছি। তিনি তার প্রধান উজির বেছে নিয়েছিলেন ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে। কারণ তিনি দেখে ছিলেন ওই লোকটা ক্রীতদাস হলে কি হবে, গুণে সর্ব অঙ্গ ঠাসা একেবারে। অবশ্য তাঁর প্রথম শ্রেণীর জ্যানিসারি হিসাবে ট্রেনিং ছিল।

আর সুলায়মানেরও প্রধান উজির ছিলেন লুফতি পাশা।

লুফতি পাশাও খ্রিস্টান বাপ-মার ছেলে ছিলেন। দশ-বারো বছর বয়সের সময় তাঁকে জ্যানিসারিতে ভর্তি করা হয়েছিল। সমস্ত ট্রেনিং সমাপন করে তিনি ঢুকেছিলেন সুলতানের প্রাসাদে। ওখানে প্রথম দিকে তিনি রাজপ্রাসাদের ফটকের বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তারপর কিছুদিন, সুলতানের খাবারের পরীক্ষক ছিলেন। অর্থাৎ কোন খাবার সুলতানকে দেওয়ার আগে তিনি পরীক্ষা করে দেখতেন ওটা ঠিক আছে কিনা।

তারপর তিনি হলেন কোন এক প্রদেশের গভর্নর। তারপর কিছুদিন কয়েকটি যুদ্ধে সুলতানের সঙ্গে গেলেন। অবশেষে তিনি প্রধান উজির হলেন।

হলে কি হবে। তিনি বিয়ে করেছিলেন সুলতানের বোনকে। একদিন হঠাৎ কি কারণে স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে সে কথা কেমন করে জানি সুলতানের কানে চলে আসে।

আর যায় কোথায় ? সুলতান তাকে ডিসমিস করে দিলেন। অবশ্য, এর চেয়েও বেশি শাস্তি দিতে পারতেন। অন্য কেউ হলে দিতেনও। কিন্তু লুফতি পাশার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা

facebook/@maktabatuttalamij

ছিল সুলতানের। সুখে দুঃখে অনেকদিন একসঙ্গে কাটিয়েছেন, তাছাড়া পাশা ভালোবাসার মতোই মানুষ ছিলেন বটে। ডিসমিস হবার পর তাঁকে একটা জমিদারি দিয়ে দেওয়া হলো। ওখানে তিনি বসে বসে পড়তেন আর লিখতেন।

কি পড়তেন, কি লিখতেন ?

একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন, তার নাম ছিল 'প্রধান উজিরের কর্তব্য'।

তিনি লিখলেন ঃ প্রধান উজির সকলের জন্য আদর্শ মানুষ হবেন। আদর্শ মুসলমান হবেন। তিনি ঘুষ খাবেন না। সমস্ত পদে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা হচ্ছে কিনা, তিনি দেখবেন। খাজনার পরিমাণ যাতে বেশি না হয়, যাতে প্রজারা কষ্ট না পায় তার দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখবেন।

গরীব প্রজাদের স্বার্থে জিনিস-পত্রের মূল্য যাতে না বাড়ে তা-ও তাঁকে দেখতে হবে। জিনিস-পত্রের দাম বাড়া চলবে না।

তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য থাকবে না। তাঁর সব কাজ হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত, জনসাধারণের মঙ্গলের স্বার্থে কৃত।

প্রধান উজির সুলতানের কাছে সব সময় সত্য কথা বলবেন। কোনো কথা গোপন করবেন না। নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে সব সত্য প্রকাশ করবেন।

সুলতানের কাছে যে সব গোপন কথা তিনি বলবেন কিংবা সুলতানের সঙ্গে সে কাজ তিনি গোপনে করবেন, গোপন পরামর্শ করবেন, তার কথা বাইরের কারো কাছে বলবেন না, এমনকি অন্য কোনো উজিরের কাছেও তা বলতে পারবেন না।

সুলতানের কাছে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের জন্য, ধর্মের জন্য, কখন কি করা দরকার তা বলবেন, কোন সঙ্কোচ করবেন না। সব চিন্তা ভাবনার কথাও নির্ভয়ে বলবেন।

তিনি ডিসমিস হয়ে যাবেন এই ভয়ে কোন জরুরী কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন না। কারণ মনের ভিতরে পাপ পুষে চাকুরি করার চেয়ে ডিসমিস হয়ে যাওয়া অনেক বেশি সম্মানের।

কেমন দেখো তো, চাকরি চলে গেল, তবু কিসে দেশের ভালো হবে, তার চিন্তা গেল না। এমন না হলে হয় না। এইজন্য ভালো ট্রেনিং দরকার

facebook/@maktabatuttalamij

লুফতি পাশার চাকরি খেলেন সুলতান। এ থেকেই বোঝা যায়, তিনি কেমন লোক ছিলেন। রেগে যেতেন, রেগে আগুন হয়ে যেতেন হঠাৎ, যদি দেখতেন কেউ তাঁকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে কিংবা কেউ তাকে ভুল বুঝিয়ে অন্য কোনো স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে।

তাছাড়া সুলতান সুলায়মান অন্যদিক দিয়ে খুব ভাল ছিলেন। সত্যিকারের রাজকীয় চেহারা আর চাল-চরিত্র। তিনি একাধারে একজন বীরযোদ্ধা, বদান্য সম্রাট ও সুশাসক ছিলেন। এজন্য তার ছেচল্লিশ বছরের রাজত্বকে বলা হয় তুরস্কের ইতিহাসের সোনালী যুগ।

মিথ্যা সাক্ষ্য দান, জালিয়াত ও সুদগ্রহণ এই তিন শ্রেণীর অপরাধীকে তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন।

শাসন ব্যবস্থায় কোন পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতি ছিল না। অপরাধ করলে দুর্নীতি করলে তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনকেও রেহাই দিতেন না।

তিনি সৎ প্রজাদের প্রতি ছিলেন কোমল। আবার অসৎ প্রজাদের জন্য বজ্রকঠোর। এটা তো একবার বলেছি। আবার বলছি। ভালো কথা বারবার বলতে হয়।

সুলতান সুলায়মান একজন বড় আইন প্রণেতা ছিলেন। অনেক আইন তিনি বানিয়ে গেছেন। তুর্কী ইতিহাসে এইজন্য তাঁকে ‘সুলায়মান কানুনী’ মানে ‘আইনদাতা’ বলা হয়ে থাকে।

শুধু কি তাই ? সাহিত্যের প্রতিও তাঁর দরদ ছিল খুব। তিনি নিজেই কবিতা লিখতেন। গজল লিখতেন। তাঁর রাজ দরবারে অনেক কবি সাহিত্যিক ছিলেন। সিদি আলী, রইস, কবি বাকি তার মধ্যে কয়েকজন।

স্থাপত্যশিল্পে, মানে দালানকোঠা তৈরির ব্যাপারেও তাঁর অনেক কীর্তি। তাঁর সময়ে মস্ত বড় একজন স্থপতি ছিলেন। নাম সিনান। মিমার সিনান। তিনিও জ্যানিসারি ছিলেন। যুদ্ধ করতেন। যুদ্ধ করতে করতে তার নির্মাণ বিদ্যা জাহির হয়ে পড়ে। সিনানের হাতেই তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত সুলায়মানী মসজিদ। নানা রংবেরংয়ের পাথর দিয়ে তৈরি এই মসজিদ এখনো সৌন্দর্যের দিক থেকে অতুলনীয়। সব মিলে বিভিন্ন জায়গায় তিনি তিনশো বারোটি নানা ধরনের ইমারত বানিয়ে গেছেন। এদের প্রত্যেকটিই একেকটি দর্শনীয় বস্তু।

সুলতান সুলায়মান একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ইসলামের সমস্ত আদেশ-নিদের্শ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি মানতেন। সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন। কিন্তু তাই বলে তিনি অন্যান্য ধর্মের কোন মানুষকে জুলুম করতেন না। বরং ভালোবাসতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, নিজের ধর্মকে কেবল মানলে হয় না, পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে হয়। এই জন্য ধর্মের ঝগড়া-ঝাটি থেকে বাঁচবার জন্য অনেক খ্রিস্টান তাঁর রাজ্যে এসে আশ্রয় নিতো।

facebook/@maktabatuttalamij

তারপর তিনি কি কেবল সব সময় গম্ভীর কাজই করতেন ?

না। তিনি অবসর সময়ে দাবা খেলতেন। বাগানের শখ ছিল তাঁর। তাছাড়া শিকারেও যেতেন মাঝে মাঝে।

তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রোক্সেলানা। দারুণ প্রভাব ছিল তাঁর উপর রোক্সেলানার। ভীষণ ভালোবাসতেন তাঁকে। কিন্তু হলে কি হবে, স্ত্রীর কথা শুনতেন তখনই, যখন দেখতেন, ওতে রাজকার্যে কোনো অসুবিধা হবে না। তিনি বলেও দিয়েছিলেন তাঁকে, 'রাজকার্যের কোনো ব্যাপারে তুমি কিন্তু নাক গলাবে না। তাহলে আমি তোমার কথা শুনবো না।'

সাহস, শৌর্য, বীর্য, মহানুভবতা, বদান্যতা, ন্যায়বিচার—এইগুলি ছিল সুলতান সুলায়মানের গুণ। এই গুণগুলোর জন্য তাঁকে প্রজারা খুব মান্য করতো, ভয় পেতো, আবার আদরও করতো। এই গুণগুলো ছিল বলে পশ্চিমদেশের ঐতিহাসিক, মানে যারা ইতিহাস লেখেন, তাঁরা সবাই একবাক্যে তাঁর নাম দিয়েছেন মহানুভব সুলায়মান—সুলায়মান দি ম্যাগনিফিসেন্ট।

এতো দাপট ছিল বীরযোদ্ধা সুলায়মানের। এতো ক্ষমতা! পশ্চিমে আলজিয়ার্স থেকে পূর্বে পারস্য উপসাগর, উত্তরে ক্রিমিয়া থেকে দক্ষিণে এডেন পর্যন্ত ছিলেন তিনি যাকে বলে মহামহিম প্রবল প্রতাপান্বিত।

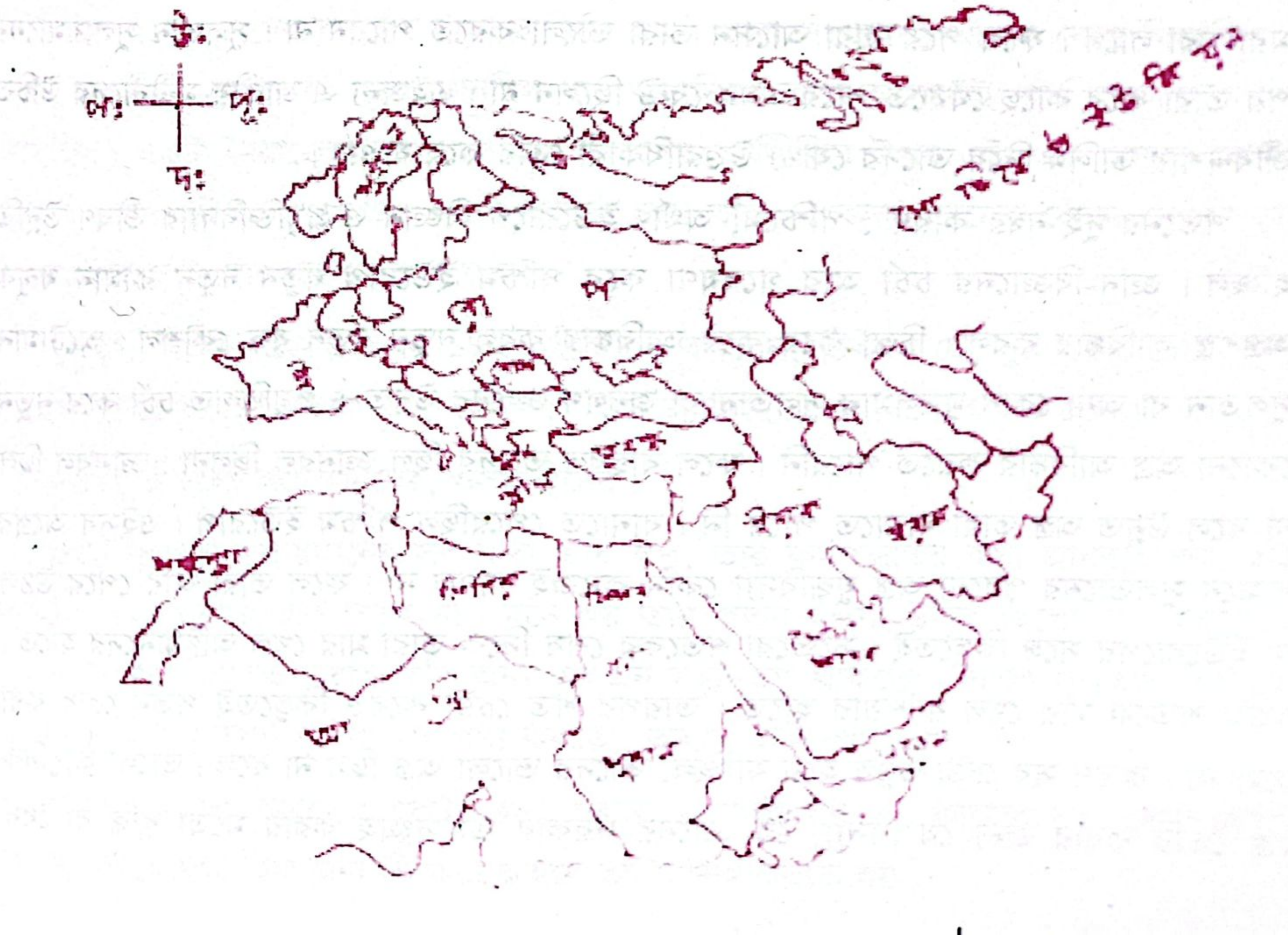

facebook/@maktabatuttalamij

অফিসারদের আর সৈন্যদের জন্য এমন এক তালিমের ব্যবস্থা করে ফেললেন, দুশো বছর যার ধার কমেনি। সৈন্যবল, অর্থবল, জনবল অপরাজিত ছিল। খ্রিস্টানরা পদানত। সুশাসন, সুপ্রতিষ্ঠা। সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, চোখ জুড়ানো বিস্ময়কর সব প্রাসাদ। বিরাট অট্টালিকা। চতুর্দিকে জয় জয়কার।

কিন্তু তবু তো টিকল না।................

আসলে, কোন জিনিসই টেকে না। চিরস্থায়ী হয় না। সে তো সবাই জানে কিন্তু সত্য ন্যায়বিচার, ধর্ম, সদিচ্ছা ইত্যাদির পরিশ্রমে ও সাধনায় যা তৈরি করা যায়, তা কোনদিন নিঃশেষে শেষ হয় না। এতোক্ষণ যা বললাম, তাতে তো এই প্রমাণিত হয়, সবগুলো সদগুণ সুলতান সুলায়মানের ছিল, সমস্ত অটোমান সুলতানের ছিল।

তবু কেন তারা টিকলেন না ? তবু কেন পতন হলো ?

পতনের এক নম্বর কারণ : সুলায়মান অত্যধিক উজ্জ্বল ছিলেন। খুব উজ্জ্বল জিনিসের পর তার মতো উজ্জ্বল বা তার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল জিনিস না থাকলে কারো ভালো লাগে না। মরা-মরা লাগে। ফলে পরে যারা আসেন তারা ভালো করতে পারেন না। সুলতান সুলায়মানের পর তাঁরা ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে এমন কেউ ছিলেন না। এইজন্য এ জাতীয় মনীষীদের উচিত জীবদ্দশায় তালিম দিয়ে তাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী তৈরি করে যাওয়া।

পতনের দুই নম্বর কারণ : পশ্চিমে, অর্থাৎ ইউরোপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভীষণ উন্নতি হচ্ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আর গবেষণা করে পশ্চিম ইউরোপ নতুন নতুন কামান বন্দুক অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করল। চিন্তা করে করে আবিষ্কার করল নতুন নতুন যুদ্ধ কৌশল। অটোমান সুলতান বা অন্য কোন মুসলমান সুলতান বা জনগণ জ্ঞানের উন্নত ও প্রযুক্তিগত চর্চা করে নতুন কোনো অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। ফলে বাহুবল তাদের ছিল জ্ঞানবল ছিলনা। জ্ঞানবল ছিল না বলে উন্নত অস্ত্র তারা বানাতে পারে নি। বানাতে পেরেছিল পশ্চিম ইউরোপ। ওইসব অস্ত্রের সামনে সুলতানের পুরনো অস্ত্র যুদ্ধবিদ্যা কোন কাজেই লাগল না। ফলে তারা আর পেরে উঠল না ইউরোপের সঙ্গে কিছুতেই। সতেরো শতকের শেষ দিকে তারা মার খেল অষ্ট্রিয়ানদের হাতে। অষ্টম শতকে মার খেল রাশিয়ার হাতে। তারপর শত চেষ্টা করেও কিছুতেই পতন রোধ করা গেল না। কারণ সব চেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছিল, তাদের ভালো অস্ত্র ছিল না বলে। ভালো আধুনিক অস্ত্র তৈরি করার জন্য যে বিদ্যা, যে জ্ঞানের দরকার তা সংগ্রহ করার মতো বুদ্ধি বা ধৈর্য

facebook/@maktabatuttalamij

কোনটাই সম্ভবত মুসলমানদের ছিল না। থাকলে ওরা এখনো সম্রাট তাকতো। ওটা নিশ্চয়ই একটা ভুল ছিল। প্রতিপক্ষের কি ক্ষমতা তা জেনে শুনেও অটোমানরা সে ক্ষমতা অর্জন করার চেষ্টা করল না।

পতনের তিন নম্বর কারণ : সৈন্যবাহিনীর জ্যানিসারিরা সবচেয়ে সুশিক্ষিত ও সুগঠিত ছিল। তারা ভীষণ শক্তিশালী ছিল। জ্যানিসারির ভয়ে ইউরোপ কাঁপত। তারা ছিল অটোমান সুলতানের সেনাবাহিনীর প্রাণকেন্দ্র। এতো যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তারা, এটাই শেষ পর্যন্ত কাল হলো। তারা দেখল, আরে, সুলতানের শক্তি বলতে তো তারাই! তারা থাকলে সুলতান আছে, সাম্রাজ্য আছে, তারা না থাকলে সুলতান থাকবে না, রাজ্য থাকবে না।

তখন তারা করল কি, তারা দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে লাগল। মানে, যেটা সুলতানের কাজ, কিংবা আমীর ওমরাহর কাজ সেটাও তারা করতে শুরু করল। সুলতান কোন কোন ক্ষেত্রে বাধা দিলে তারা অবাধ্য হতো, দুর্ব্যবহার করতো, বলতো, আপনি চুপ করুন, যা জানেন না তা নিয়ে কথা বলতে আসবেন না। আমরা জানি, কোথায় কখন কি করতে হবে। তাদের ব্যবহার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তারা সংখ্যায়ও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ফলে, একদিকে সুলতানকে তারা মানছিল না। অন্যদিকে তারা অনেকেই পার্শ্ব ব্যবসায় লেগে গিয়েছিল। একটা নৈরাজ্যের ভাব চলে এল। দেশের অর্থনীতির উপর এটা এক অসম্ভব বোঝা হয়ে দাঁড়াল। এইসব দেখেশুনে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে যায়। যেজন্য তাদের বেতন দেওয়া সে কাজের নাম নেই, মাঝখান থেকে ঝামেলা।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ তখন ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে বললেন,"ঠিক আছে, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। সব জ্যানিসারি বন্ধ, বাতিল।" ব্যস জ্যানিসারিদের বিলোপ ঘটে গেল।

পতন তো হলো অটোমানদের, ওসমানীদের।

অথচ সুলতান সুলায়মানের সব কথা তাঁর স্বপ্ন, তার কর্মপদ্ধতির কথা জানবার পর, এই পতনের কথা শুনতে ভাল লাগে না। মনে হয় তার পতন হওয়া উচিত ছিলো না। মহানুভব সুলায়মান না থাকলেও তুরস্কে যদি অন্য একজন মহানুভব থাকতো—যাকে সুলতান হিসাবে, মুসলমান হিসাবে সমস্ত পৃথিবী মান্যগণ্য করতো, তাহলে ভাল লাগতো।

তাহলে বুঝতে পারছো, একটা কাজ কেবল করলেই হয় না, কাজের ফল ভোগ করার ব্যবস্থা করতে হয়। তার জন্য কি করতে হবে তা-ও ঠিক করতে হয়।

facebook/@maktabatuttalamij

ধরো, তুমি একটা জাহাজ বানালে। এখন বানালেই তো হলো না, ওটাকে পরিষ্কার রাখতে হবে, ওর ইঞ্জিনে সময় মতো তেল দিতে হবে, কোন অংশ নষ্ট হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করতে হবে, ওর সমস্ত নাবিকদের ভালমন্দ দেখতে হবে, আবার যাতে তারা বিদ্রোহী না হয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। আর ? আর কি করতে হবে ?

অন্য কেউ এসে যাতে তোমার জাহাজ ভেঙে না ফেলে, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হবে না ? হ্যাঁ , কেবল একটা জিনিস বানালেই হয় না, তাকে রাখতে জানতে হয়।

অটোমানরা রাখতে যদি জানতো, তাহলে ওরা এখনো বিশ্বের একটা 'বড় শক্তি' হয়ে থাকতো। তাদের নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারতাম।

ইফা—২০১৭-২০১৮—প্র/১০৭১৭(রা)—৩,২৫০

facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

facebook/@maktabatuttalamij